চীন
দেশের
কথা
SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

চীনা শিল্পের কথা

4523

প্রভাতকুমার দত্ত
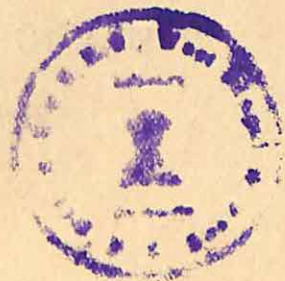
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬১

প্রকাশক

নির্মলকুমার সরকার

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভা আর্ট প্রেস

১১৫এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ

খালেক চৌধুরী ও

ষোড়শ শতাব্দীর একটি চীনা চিত্রের সাহায্যে

ব্লক

ব্লকম্যান

ছবি ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

709.51
DAT

দাম দু'টাকা

লেখকের বক্তব্য

চীনের সংগে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু শতাব্দীর। মধ্যযুগের অব্যবহিত পরবর্তী কাল থেকে এশিয়ায় বিদেশী আধিপত্যের দরুণ এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। সম্প্রতি চীনে জনগণের রাষ্ট্র এবং ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই দুই প্রাচীন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আবার নতুনভাবে স্থাপিত হতে চলেছে। একথা আজ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে বর্তমান পৃথিবীজোড়া সংকট আর অনিশ্চয়তার মধ্যে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ভারত ও চীন বিশেষ অবদান যোগাতে পারে। এরই জন্য আজ দুই দেশের মানুষ পরস্পরকে ঘনিষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে উৎসুক। একথা স্মরণ করে চীনাশিল্পের উপর বর্তমান ক্ষুদ্র ভূমিকা প্রকাশ করা হল। আমার মনে হয় বাংলা ভাষায় এই ধরনের বই আর নেই। চীনা শিল্পের সুবিপুল ঐতিহ্যের প্রকৃত মর্যাদা দিতে গেলে আরো বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কিছু করা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশের বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব নয়। "চীনা শিল্পের কথা" যদি পাঠককে চীনা শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে এবং তার মধ্য দিয়ে যদি চীন ভারত মৈত্রীর পথ কিছুটা প্রশস্ত হয় তাহলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

ভারত-চীন মৈত্রীর উদ্দেশে

চীনা শিল্পের বৈশিষ্ট্য

চীনা শিল্পে প্রথমেই যে জিনিষটা আমাদের চোখে পড়ে তা হচ্ছে এর রেখাগত ছন্দ যাকে ইংরাজীতে বলা হয় linear rhythm। চীনা শিল্পের রেখানির্ভর হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে এর সংগে calligraphy অর্থাৎ হস্তাক্ষর পদ্ধতির অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক বর্তমান। অন্য কথায় চীনা চিত্র ঐ দেশের লিখিত অক্ষরেরই সম্প্রসারণ। সেজন্যেই দেখা যায় চীনে যাঁরা ভালো আঁকতে জানেন তাঁদের হাতের লেখাও সুন্দর। একথা কিন্তু অন্যান্য শিল্পধারায় তেমন সত্য নয়। সেকারণে সেই সমস্ত দেশের শিল্পও রেখানির্ভর নয়। এছাড়া চীনা শিল্পের যে মাধ্যম অর্থাৎ জলরঙের মতই ব্যবহৃত চীনা কালির প্রচলন থাকায় রেখানির্ভরতাটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রেখানির্ভর শিল্পের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর বাইরের গড়নটাই দেখানো চলে এবং এর মধ্যেই এই শিল্প ধারার সবকিছু সৌন্দর্য নিহিত। ইউরোপীয় কি অন্যান্য দেশের শিল্পের মত

বিষয়সূচী

চীনা শিল্পের বৈশিষ্ট্য ১
চিত্রকলা ১০
ভাস্কর্য ২৪
মৃৎপাত্র ৩০
বয়নশিল্প ৩৯
ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য শিল্প ৪৮
কাঠ খোদাই ৫৪
লিথোগ্রাফ ৬৩

চিত্রসূচী

১) কবি লি টাই-পো (খৃষ্টাব্দ ৭০০—৭৬২)—লিয়াংকাই অঙ্কিত
(ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার শিল্পী)
২) বৃহৎ ভৈরোচন বুদ্ধ খৃঃ ৬৭২—৬৭৬ মধ্যে লুঙ মেন নামক স্থানে নির্মিত
৩) রঙকরা মাটির পাত্র (উচ্চতা ১৪″) হান বংশের আমলে নির্মিত
৪) সিল্কের পরদা (চওড়া ১২″) ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর
৫) ব্রোঞ্জের তৈরী চীনের বিভিন্ন ধরণের প্রাচীন বাসনপত্র
৬) ফসল কাটার দৃশ্য (আধুনিক)—লি হুয়া অঙ্কিত

আমরা যদি চীনা শিল্পে বিষয়বস্তুর ঘনত্ব খুঁজি তাহলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। এই শিল্পধারায় যে detail কাজ হয় না তা মোটেই নয়, তবে তা রেখার নিখুঁত রূপায়ণের জন্য—বস্তুর ঘনত্ব বোঝানোর জন্য নয়। রেখাকে ছেড়ে যখন বস্তুর ঘনত্বে যাওয়া যায় তখন চিন্তার জটিলতাটাই বড় হয়ে ওঠে, কল্পনার সেই সহজ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। চীনারা কিন্তু ইউরোপীয় অর্থে চিন্তা বা বুদ্ধির জটিলতায় মোটেই অভ্যস্ত নয়। পরম্পরাগত চীনা শিল্পে প্রকৃতি, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিশিষ্ট স্থান রয়ে গেছে। চীনারা চারপাশের জগতে ঘনত্বের তুলনায় রেখার যে প্রাবল্য লক্ষ্য করেন এবং তার সাহায্যে যে সহজ জীবন বোধ বিকশিত হয় শিল্পে তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। চীনাদের কাছে শিল্পে, বিশেষ করে চিত্রে, বাইরের জগতের ছন্দোময় গতির প্রকাশ ঘটেছে মূর্তির বাইরের পরিধির দৃঢ় প্রবহমানতায় এবং বিশেষ করে আচ্ছাদনের সংস্থাপনে, যাকে আলাদাভাবে না দেখিয়ে মূল কাজেরই অংশরূপে দেখানো হয়েছে। আর এই আচ্ছাদন যে কোন স্থানেই সংস্থাপিত হোক না কেন এর ভাঁজের গতি থেকেই রেখানির্ভর ছন্দের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, চীনাদের এই রেখানির্ভরতা সম্পর্কে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে এর অবিচ্ছিন্ন এবং প্রবহমান বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় শিল্পের মত এখানে রেখার কোন হেঁচকা টান বা বিচ্ছিন্নতা এমন কি আড়ষ্ট ভাব মোটেই

লক্ষ্য করা যায় না। চীনা শিল্পে অপ্রীতিকর এবং দৃষ্টি-বিভ্রমকারী কোন কিছুর উপস্থিতি নেই। তার কারণ চীনাদের দ্বারা ব্যবহৃত রেখার প্রবহমানতা। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন চীনারা যেহেতু ছন্দের উপর বেশী নির্ভরশীল, ফলে চীনা চিত্র বুঝি সবই সমতলা বিশিষ্ট বা চ্যাপ্টা। এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা কারণ চীনারা রেখার সাহায্যে বাইরের যে গড়ন তৈরী করেন তার স্বকীয় প্রসাদগুণের মধ্য দিয়েই বিষয়বস্তুর ঘনত্বের আভাস পাওয়া যায়। এখানে রেখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও বিষয়বস্তুর plasticity বা গঠন যোগ্যতার কথা শিল্পীরা কখনও বিস্মৃত হন না। চীনারা—যাদের জাতি হিসাবে শিল্পীর জাতি বললে অত্যুক্তি হয় না—তাদের শিল্প যে শুধু অবিচ্ছিন্ন রেখা ব্যবহার নয় তার গড়নেরও যে একটা দিক আছে একথা বলে দিতে হয় না। গঠনের অভাবে যদি দর্শকের দৃষ্টি হটাৎ লাফিয়ে ছবির বহির্ভাগে চলে আসে তবে তাকে চীনারা শিল্পীর দক্ষতার অভাব বলেই মনে করেন।

ইউরোপীয় শিল্পে আমরা লক্ষ্য করি যে সেখানে শিল্পীরা নিজের জাতের উপর নজর দিয়েছেন বেশী। অর্থাৎ জীব হিসাবে মানুষই যখন শ্রেষ্ঠ তখন মানুষ এবং তার বিভিন্ন রূপই শিল্পের প্রধান বিষয়বস্তু। গ্রীক ভাস্কর্য—যার কদর সব যুগেই বজায় থাকবে—তাতে দেখা যায় মানুষের দৈহিক গঠন, পেশী, সুঠাম বিন্যাস প্রভৃতির সযত্ন উল্লেখ। এ ছাড়া

নারী দেহের সাবলীল অথচ দৃপ্ত ভঙ্গীর প্রকাশও রয়েছে এখানে। এককথায় গ্রীক ভাস্কর্যে পাই মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য তথা গঠনগত বীর্যের বিজয় ঘোষণা। এরপর মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য ঠিক গ্রীক ভাস্কর্যের পুনরাবৃত্তি নয়। কারণ গ্রীক মূর্তিতে কেবল স্থূল দেহটাকেই দেখা যায় যার মধ্যে মানুষ তার প্রতিমূর্তির বিরাটত্বকে দেখে শুধুমাত্র বিস্মৃত হয়। কিন্তু মাইকেল এঞ্জেলোতে আমরা এই বিস্ময়ের উপরেও মানুষের দেহের যে ছন্দ বা কাব্যময় দিক তারও পরিচয় নাই। দৃপ্ততার মধ্যে যদি কাব্য সুলভ সহজ ছন্দ না থাকে তবে কাঠিন্যের ভাবই বড় হয়ে ওঠে। গ্রীক ভাস্করদের এ বিষয়টি একেবারে দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গিয়েছিল। আর এটা থাকার জন্যই মাইকেল এঞ্জেলোর কাজ সকলের এত প্রিয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী শিল্পী রোঁদা (Rodin) এই ধারাকেই নতুনভাবে মহিমামণ্ডিত করেন। এক অর্থে তিনি মানুষের প্রতিমূর্তি অঙ্কন বা খোদাইয়ের জ্ঞানকে বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত করেন। কারণ এখন আর দৈহিক সৌন্দর্য নয় মানুষের সুখ-দুঃখ প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি বিষয়ের উপরও ভাস্কর্য রচিত হতে থাকলো। অর্থাৎ রোঁদার বিশেষ প্রচেষ্টার ফলে ভাস্কর্যকে আমরা আরো আপনার করে নিতে পারলাম। যাই হোক ইউরোপীয় শিল্পে এই যে মানুষের নিজের জাতের উপর নজর তা চীনা শিল্পে একান্তই অনুপস্থিত। ঐতিহ্যের দিক থেকে চিন্তা করলে

চীনারা নিজেদের জগতের অন্যান্য জিনিষের থেকে আলাদা করে নিয়ে বিশেষভাবে কোনদিন বিচার করেননি। চীনাদের কাছে মানুষ আর প্রাকৃতিক জগত একেবারেই অভিন্ন। বরং এই পটভূমিকায় তাঁরা নিজেদের জাতকে অপ্রধান হিসাবে রেখে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের প্রতি সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চান। ইউরোপীয় শিল্পে যেমন প্রকৃতির উপস্থিতি বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না—মানুষই সেখানে মুখ্য বস্তু তেমন চীনা শিল্পে নয়। এখানে মানুষকে সর্বেসর্বা হিসাবে জ্ঞান না করে অন্যান্য অংশের মত তাকে প্রকৃতিরই একটা অংশ হিসাবে দেখা হয়েছে। চীনা শিল্পীরা প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে যতটা ঘনিষ্টভাবে জানেন ততটা বোধ হয় আর কেউ নয়। চীনা শিল্পীর আঁকা বাঁশঝাড়, মোরগ কি মহিষ এতই জীবন্ত যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা মোটেই সম্ভব নয়। এই সমস্ত ছবি দেখে মনে হয় চীনাদের এগুলি আঁকার জন্য বোধ হয় বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয় না, বাইরের জগতের সংগে আত্মীয়তাটা যেন একান্তই সহজাত। ইউরোপীয় শিল্পের দৃষ্টান্ত থেকে অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে বাইরের জগতের রূপায়ণে অভিজ্ঞতাই হচ্ছে মূলকথা। কেবল সহজাত কল্পনা দিয়ে কিছু হয় না। কিন্তু চীনা শিল্পে বোধ হয় একথা খাটে না। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের ব্যাপারে জাতীয় সাধনা ও তার প্রভাবের একটা মূল্য আছে। চীনা শিল্পের গোড়াকার যুগে আজকের মত বিচ্ছিন্ন শিল্প সাধনা

মোটেই বজায় ছিল না। শিল্পসৃষ্টি ছিল আধ্যাত্মিক তথা সামগ্রিক জীবন সাধনার একটা বিশিষ্ট মাধ্যমমাত্র। আর এই সাধনার উপযোগী স্থির ও অচঞ্চল দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের জন্য শিল্পী সাধককে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকৃতি জগতের দ্বারস্থ হতে হোত। পরে অবিশ্যি অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু বাইরের জগত সম্পর্কে এই যে সহজাত জ্ঞান ও গভীর দৃষ্টি তা একরকম জাতীয় বৈশিষ্ট্যেই পরিণত হয়েছে। এত সহজ অথচ তাৎপর্যময় যাদের প্রকৃতির বর্ণনা, একমাত্র তাদেরই যে প্রাকৃতিক জগতের ব্যাখ্যার যোগ্যতা আছে একথা বলা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

চীনা শিল্প তার নিখুঁত অথচ ভাবময় আঙ্গিকের জন্যই সকলের কাছে সমাদৃত। একমাত্র decorative শিল্প সৃষ্টি ছাড়া, চীনা কালি যার বৈশিষ্ট্য জলরঙেরই সামিল তার সাহায্যে এতটা নিখুঁত কাজ আর কোথাও চোখে পড়ে না। আশ্চর্য এই এতটা নিখুঁত রূপায়ণের মধ্যেও কল্পনার অফুরন্ত অবসর ; সৃষ্টিরও কোন অভাব নেই। আজকের দিনে পরম্পরাগত চীনা শিল্পের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু এর আঙ্গিক সম্পর্কে হয়ত সে কথা খাটে না। কারণ এই আঙ্গিক শুধু যে এক বিরাট প্রাচীন জাতির সাধনার সামগ্রিক ফল তাই নয়—শ্রেষ্ঠ শিল্পের যে মূলকথা অর্থাৎ সহজ সরল অথচ গাম্ভীর্যময় আবেদন, তা এখানে পুরোমাত্রায় বজায় রয়েছে। শিল্প জিনিষটা মোটেই কারসাজি

নয়। আজকের দিনে অনেক ক্ষেত্রেই অভিনব আঙ্গিকের সাহায্যে চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে আসর জমানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার মধ্যে হয়ত নৈপুণ্য আছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রধান গুণ এখানে বজায় থাকছে না। সেদিক থেকে চীনা শিল্পের আঙ্গিক যে কতটা আন্তরিক আর মহৎ সৃষ্টির উপযোগী তা সহজেই চোখে পড়ে। আর একটা কথা ইউরোপীয় শিল্পে Tragic Spirit বলে যে জিনিষটা অনেক শিল্পীর ছবিতে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় সেটা চীনা শিল্পে একেবারেই অনুপস্থিত। পরম্পরাগত চীনা শিল্প প্রকৃতিগত হয়েও জীবন সম্পর্কে কখনও নিরাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেনি। এজন্যেও বোধ হয় চীনা শিল্প এতটা সমাদৃত।

চীনা শিল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় তা হচ্ছে আলোচ্য শিল্পের একান্ত ঐতিহ্যময় বা পরম্পরাগত রূপ। একথা অবিশ্যি আগেই বলা হয়েছে কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব থাকায় আলাদাভাবে এই দিকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। আধুনিক কালে চীনের মত আর কোন দেশের শিল্পকলা এতটা ঐতিহ্য অনুসারী নয়। আজ'কর দিনেও, যে কোন চীনাশিল্পীর আঁকা ছবির অঙ্কন পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে চীনের সমগ্র শিল্পী ঐতিহ্যটাই আমাদের মানসপটে উদিত হয়। যিনি ছবি এঁকেছেন তিনি এখানে গৌণ বরং শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমগ্র জাতির অবদানটাই মুখ্য। সপ্তম শতাব্দীতে টাঙ

আমল কি তার পরবর্তী সুঙ বা বা মিউ আমলের সংগে এখনকার চিত্রের আত্মিক spirit এবং পদ্ধতিগত technique-এর যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ট। চীনা শিল্পের মূল যে রেখা একথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। টাঙ বা সুঙ-শিল্পীরা রেখার যে মাধুর্য প্রবর্তন করেছিলেন, তা বর্তমানেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে অনুসৃত হয়ে আসছে। চীনা শিল্পে মানুষ আর প্রকৃতিকে আলাদা না করে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখার মধ্যেই এর ঐতিহ্যপরায়ণতার কারণ নিহিত। শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ফলে শিল্প ক্রমশই প্রকৃতির জগত থেকে সরে এসেছে। কিন্তু চীনাশিল্পীরা মানুষ আর প্রকৃতির নিরবধিকালের স্বাভাবিক সম্পর্ককে রূপায়িত করায় শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত অবিচ্ছিন্নতা বজায় থেকেছে। অবিশ্যি একথা ঠিক ইউরোপের মত চীনদেশে সমাজ ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের বহুশতাব্দীকাল কোন পরিবর্তন না হওয়ায় মানুষ ও প্রকৃতির পুরাতন সম্বন্ধেরও কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। চীনাশিল্পের ঐতিহ্যনির্ভরতা থেকে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন এই পরিস্থিতি কি শিল্পের অগ্রগতির পরিপন্থী নয়। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করায় চীনা শিল্পীদের মধ্যে কোন অতৃপ্তি নেই। বহুদিনের সাধনায় অঙ্কনপদ্ধতি এবং তার ভাবাদর্শ এমনই জাতীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত যে তাকে পরিত্যাগ করায় কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া শিল্পের যাঁরা রসগ্রাহী তাঁদের দিক থেকে চীনাশিল্পের

রস-উপভোগের বেলায় কোন ক্লান্তি তো লক্ষ্য করা যায় না বরং চীনা ছবির মারফৎ আমরা প্রাচীন এক সভ্যতার সমৃদ্ধ ভাব সম্পদের পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হই। সাম্প্রতিক কালে ইউরোপের বস্তু-সম্পর্কহীন (non-representational) চিত্র সৃষ্টি তার অস্বাভাবিক পরিবর্তনশীল রূপ এবং বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে চীনা শিল্প বদ্ধ আবহাওয়ায় মুক্ত বাতাসের মতই আরামদায়ক। চীনা শিল্প তাই সকলের কাছে সমান সমাদরের বস্তু।

চিত্রকলা

চীনা চিত্রকলার ঐতিহ্য যে খুবই প্রাচীন একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে জানার যথেষ্ট অসুবিধা আছে। সেকালে আলোকচিত্রের প্রচলন ছিল না যার সাহায্যে একমাত্র ব্যাপক-ভাবে শিল্পের ঐতিহ্যকে স্থায়ী করা সম্ভব। চীনা শিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে যে এর শ্রেষ্ঠ নজীরগুলির বেশীর ভাগই নানা উপায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমন চীনের পশ্চিম সীমান্তে তুঙহুয়াং গুহায় তিনশো-টি প্রাচীরচিত্র আজ একেবারেই নিশ্চিহ্ন। এছাড়া সুঙ আমলের সিল্কের উপর অমূল্য কাজ তাতারদের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। যাই হোক চীনা চিত্রকলার যে সামান্য সম্পদ আজ সকলের দৃষ্টিগোচর তা এই শিল্পধারার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত।

চীনা চিত্রকলার প্রথম পর্যায় হিসাবে সাধারণত খৃষ্টজন্মের সময় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত যে কাল তাকেই ধরা হয়ে থাকে। এই যুগে যে সমস্ত শিল্পীর কাজ পাওয়া গেছে তার

মধ্যে একমাত্র কু-কাই-চি হচ্ছেন সবচেয়ে স্মরণীয়। এঁর "দৃশ্যাবলী" নামে বিখ্যাত চিত্র ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। এটি সিল্কের কাপড়ের উপর আঁকা এবং অনেকগুলি দৃশ্য বর্ণিত হওয়ায় জিনিষটিকে গুটিয়ে রাখতে হয়। অবিশ্যি গুটানো ছবি চীনা চিত্রকলার বিশিষ্ট রীতি। দেয়ালে টাঙানোর প্রয়োজন থেকে এর উদ্ভব। এজন্যে এই ধরণের ছবিতে আমাদের দৃষ্টি উপর থেকে নীচে ফেরাতে হয়। যাই হোক কু-কাই-চির কাজের সব চেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এর মানবিক আবেদন। একথাটা কেবল যে কু-কাই-চি'র ছবি সম্পর্কে প্রযোজ্য তা নয়। চীনা শিল্পের সমগ্র ইতিহাসে এ জিনিষ চোখে পড়ে। এ মানবিকতা কোন একজন শিল্পীর বিশেষ মনোভাবের প্রকাশ নয়, তা সমগ্র জাতের। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কারণ সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যমকে বাদ দিয়েও একমাত্র চিত্রকলার মারফৎ আমরা চীনা চরিত্রের সংযম, পরিশ্রমী এবং অল্পভাষী মনের পরিচয় পাই, এটা কম গৌরবের কথা নয়।

কু-কাই-চির ছবি দেখতে দেখতে চীনা শিল্পের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের মনে উদয় হয়। চীনা হস্তাক্ষর পদ্ধতিকে 'ক্যালিগ্রাফিক' বলা হয়ে থাকে। এটি প্রধানত চিত্রধর্মী। এজন্যই আমরা দেখতে পাই চীনদেশে বিভিন্ন জাতের লোক থাকলেও চীনা লিখিত ভাষা চিত্রধর্মী হওয়ায় সবস্থানে সমানভাবে বোধগম্য। এখন চীনা শিল্প হচ্ছে

এই লিখিত অক্ষরেরই সম্প্রসারণ। তাই চীনদেশে ছবি আঁকা কথাটা ব্যবহৃত হয় না ; ব্যবহৃত হয় ছবি লেখা কথাটা। যাঁরা শিল্পী হতে চান তাদের প্রথমে হস্তাক্ষর নিখুঁতভাবে অভ্যাস করে নিতে হয়। যাঁর হস্তাক্ষর ভালো নয় তিনি কোনকালেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে গণ্য নন ! চীনা শিল্পীকে সব সময় তাঁর তুলির টান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়। চীনা শিল্পীরই তুলির টান কাগজের উপর একবারই পড়ে এবং তা হয় সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ এবং প্রামাণিক। এজন্যে চীনা চিত্রকলায় শিল্পীর গভীর আত্মস্থ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

চীনের বহু প্রাচীন খ্যাতনামা শিল্পীদের সম্পর্কে একথা প্রচলিত আছে যে ছবিতে তাঁদের তুলির শেষ টানের সংগে সংগে বিষয় বস্তুতে সত্যিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, অর্থাৎ ঘোড়ার মূর্তিটি যেন প্রাচীরচিত্রকে ছেড়ে টগবগিয়ে চলে গেছে কিম্বা ড্রাগনটি যেন শূন্যস্থানে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় চীনা শিল্পে গতি তথা প্রাণধর্মকে অদ্ভুত-ভাবে বাস্তব করে তোলা হয়েছে। কু-কাই-চি তাই বলেছেন যে, ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরই সে ছবির বিষয়বস্তু পূর্বগামী যাঁরা অবিনশ্বর তাঁদের পর্যায়ভুক্ত হয়। অনেকে চীনা চিত্রের এই গতি জিনিষটাকে rhythm বা ছন্দের সংগে তুলনা করেছেন। কিন্তু চীনা শিল্পীরা শুধুমাত্র ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্যই ছবিতে গতির আদর্শকে প্রাধান্য দেননি। বাইরের

জীবনে প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তিনিচয়ের প্রকাশ, শিল্পীরা ছবিতে তাকেই ধরে রাখতে চেয়েছেন। শিল্পের এই যে দৃষ্টিভঙ্গী তা ইউরোপীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য থেকে একেবারেই ভিন্ন। ইউরোপীয় শিল্পে ব্যক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে শিল্প শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। চীনা শিল্পে কিন্তু এই ধারণা পূরাপূরি অচল।

সপ্তম শতাব্দী থেকে চীনা চিত্রকলায় T'ang Dynasty বা টাঙ রাজবংশের সুরু। এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম হচ্ছেন ইয়েন-লি-পেন। টাঙ যুগের চিত্রে অতীতের তুলনায় আরো পূর্ণাবয়ব মূর্তি, গোলাকার মুখের গড়ন, পূর্ণ অধর এবং শান্ত ভাব লক্ষ্য করা যায়। টাঙ যুগের চিত্রকলার বহু নিদর্শন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। অবিশ্যি এই যুগ চীনাশিল্পের একটি বিশিষ্ট পর্যায়। এই সময়ে চীনা সাম্রাজ্যের বহুধা প্রসার ঘটে এবং বিশেষ করে পশ্চিমদিকে রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারিত হয়। ফলে চীনারা এই সমস্ত নব অধিকৃত অঞ্চলের শিল্প নিদর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট ঔৎসুক্য দেখায়। টাঙ আমলেই ভারতের বৌদ্ধ শিল্পকলার আদর্শ চীনদেশে প্রচারিত হয়। চীনা শিল্পে বৌদ্ধ শিল্পের প্রভাব পরবর্তী সুঙ ও মিঙ বংশের আমলে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্যাপকতা অর্জন করে। এই সময়ে যে সমস্ত শিল্পী বৌদ্ধ আদর্শে প্রভাবিত হয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন তাঁদের মধ্যে যূ-টাও-জু সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধের জন্মকথা এবং জাতক কাহিনীর

উপর ভিত্তি করে বহু চিত্র এই কালে রচিত হয়। এ সমস্ত চিত্রে ভারতীয় অঙ্কনপদ্ধতির ছাপ সুস্পষ্ট চোখে পড়ে তবে শিল্পের যে মূল গড়ন তা নিঃসন্দেহে চীনের নিজস্ব। আমরা বৌদ্ধ ভাবধারায় প্রভাবান্বিত য়ু-টাও-জুর নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। এঁর প্রতিভাকে মাইকেল এঞ্জেলো এবং রুবেনসের সংগে তুলনা করা হয়ে থাকে। এর কাজ দেখে মনে হয় যেন তাঁর হাত ঝোড়ো বাতাসের দ্বারা পরিচালিত। অত্যন্ত অল্প আয়াসে বিষয়বস্তুর ঘনত্ব বোঝানোয় তাঁর ছিল অদ্ভুত দক্ষতা।

চীনা শিল্পে অশ্বের ক্ষিপ্রগতিকে রূপায়িত করার এক বিশেষ রীতি লক্ষ্য করা যায়। অশ্ব হচ্ছে গতি এবং মুক্তির প্রতীক। টাঙ যুগে হান্ কান্ নামে এক শিল্পী ছিলেন এই ধরনের মূর্তি অঙ্কনের বিশেষ পারদর্শী। এসময়ের বিভিন্ন মৃৎশিল্পের কাজে এই শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় মেলে। এখানে একটা জিনিয লক্ষ্যণীয়, চীন দেশে প্রাচীনযুগে যে সমস্ত মহৎ শিল্পী যে অঙ্কনপদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন তা পরবর্তীকালে সংরক্ষিত হয়েছে, অল্প কিছু অদল বদল হলেও তার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় নি। চীনা শিল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই এদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। মূর্তি অঙ্কন ছাড়া চীনা চিত্রকলার অন্য বিশিষ্ট দিক অর্থাৎ দৃশ্য চিত্রের বিকাশও টাঙ যুগে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। একালের দুইজন প্রথিতযশা দৃশ্যচিত্রশিল্পীর নাম হচ্ছে যথাক্রমে

লি-সু-সুন এবং ওয়াংটই। চীনা চিত্রকলার ঐতিহ্য খুব প্রাচীন হলেও চিত্ররীতিতে কোন স্থানেই প্রাগৈতিহাসিক মনোভাবের ছাপ চোখে পড়ে না। এর অর্থ হচ্ছে দৃশ্যচিত্রে দূরত্ব বোঝানো এবং তার মধ্যে বস্তুর সংস্থানের ব্যাপারে প্রাগৈতিহাসিক চিত্রে যে অনভ্যস্ত আড়ষ্টতা চোখে পড়ে তা থেকে চীনা শিল্প সব সময়েই মুক্ত। যাই হোক উপরিলিখিত দুজন শিল্পীর মধ্যে লি-সু-সুন ছিলেন অনেকটা 'ফর্ম্যাল'; সে তুলনায় ওয়াংউইকে রোম্যান্টিকপন্থী বলা চলতে পারে।

চীনা শিল্পে এর পরের আমলকে বলা হয় সুঙ বংশের আমল। এই আমলকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয়; গোড়ার দিকটিকে বলা হয় উত্তরের সুঙ এবং শেষ দিকটাকে দক্ষিণের সুঙ বলে। টাঙ যুগের তুলনায় এযুগের শিল্পের ইতিহাস বিভিন্ন নথিপত্র এবং সাহিত্যপ্রমাণ প্রচুর হস্তগত হওয়ায় খুবই বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য। উত্তরের সুঙ আমলের শিল্পীদের মধ্যে লি লুঙ মিয়েন হচ্ছেন সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান। ইনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে ঐতিহ্যপন্থী। প্রাচীন বহু শিল্পীর ছবি কপি করার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আকর্ষণ। কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল সুবিদিত। লি লুঙ মিয়েনের সমসাময়িক হচ্ছেন শিল্পী কুও-সি। দৃশ্যচিত্র শিল্পী হিসাবে ইনি পরিচিত। দৃশ্যচিত্র আঁকার ব্যাপারে তিনি নানা তত্বগত আলোচনাও করেছেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে চীনা শিল্পে সুঙ বংশের আমল হচ্ছে দৃশ্যচিত্রেরই আমল। চীনা শিল্পের শ্রেষ্ঠ দৃশ্যচিত্রগুলির বেশীর

ভাগই এই সময়ে সম্পন্ন হয়। চীনদেশের সামগ্রিক শিল্পসাধনার সংগে দৃশ্যচিত্রের আবেদনের অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। পরম্পরাগত সৃষ্টিতে চীনা শিল্পীরা ছিলেন একাধারে সাধক ও শিল্পী। সুতরাং প্রকৃতিতে নিছক বৈচিত্র্যের সন্ধান না করে সমস্ত কিছুর পেছনে যে শক্তি বা গতি কাজ করছে তাকেই তাঁর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর সাধকের মন থাকায় আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সংযম ও নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেছে। এজন্যেই বর্তমানে নতুন চীনে আমরা দেখি জগত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী আরো বৈজ্ঞানিক রূপ ধারণ করলেও বহু শতাব্দীর সাধনায় জাতীয়ভাবে যে অঙ্কনরীতি গড়ে উঠেছে তাকে সহজে আমূল পরিবর্তিত করতে চীনারা ইচ্ছুক নন।

এর আগে আমরা উল্লেখ করেছি টাঙ আমলে চীনা শিল্পকলায় বৌদ্ধ মতাদর্শের প্রভাব বিস্তৃত হয়। সুঙ বংশের কালে এই অবস্থায় যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। এর আগে ছিল বুদ্ধ ও বোধিসত্ব মূর্তির প্রাবল্য। বুদ্ধ বা অরজুতদের (বুদ্ধের নিকট শিষ্য) দেখানো হোত দূর এক স্বর্গরাজ্যের অধিষ্ঠাতা হিসাবে। মানুষের মনে এঁদের সম্পর্কে কোন প্রকার নৈকট্যবোধের অনুভব ছিল না। সুঙ আমলে দেখা গেল ভারতাগত বৌদ্ধ প্রভাবের বাইরের যে জাঁকজমক ও আড়ম্বরের দিক, তাকে পরিহার করে দৃষ্টিকে আরো সংহত ও জীবনানুগ করে তোলার আকর্ষণ। এর ফলে বোধিসত্বের মূর্তির বদলে ছোটখাটো সাধুসন্ত এবং ধর্মাধ্যক্ষদের মূর্তির

১নং চিত্র
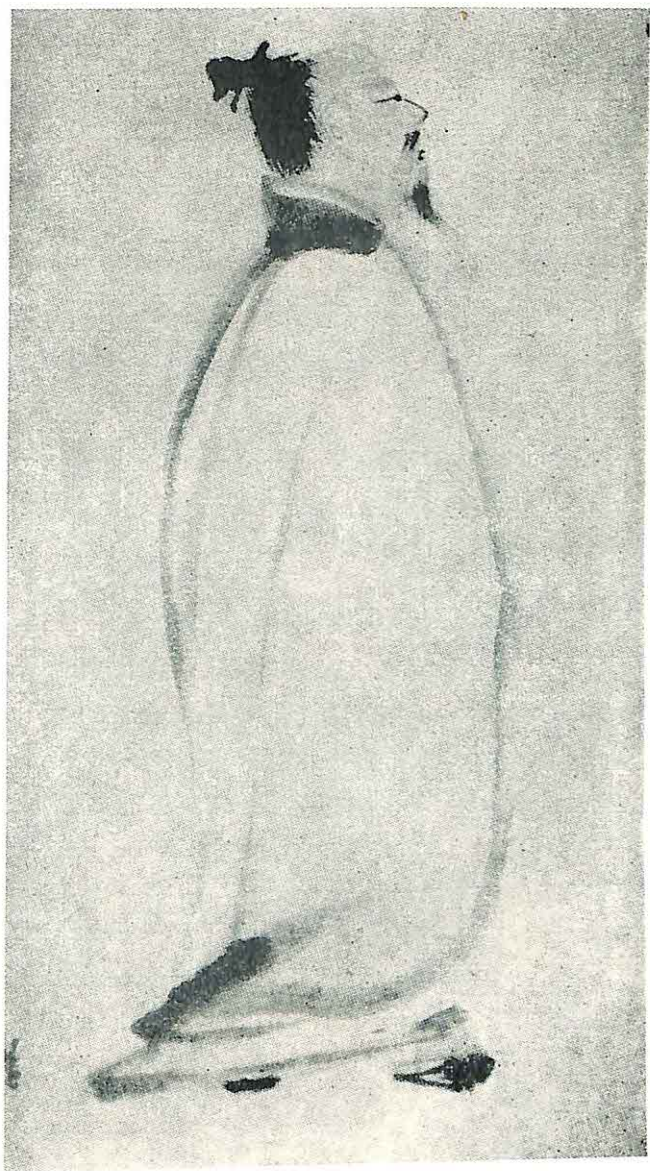
২নং চিত্র

প্রচলন লক্ষ্য করা গেল। এমন কি শাক্যমুণিকে বুদ্ধ হিসাবে না দেখিয়ে মানুষের দুঃখ কষ্টের সহভাগী পুরুষ রূপে দেখানো হোল।

অনেকটা ভারতবর্ষের মত চীনা শিল্পের সুদীর্ঘ ইতিহাস ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে ধর্মের কোন সামাজিক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু অতীতে ধর্মই ছিল সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগের মূল অনুপ্রেরণার বস্তু। চীনা শিল্পের যে অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্যের আমরা সকলেই গর্ব করে থাকি তাতে ধর্মসাধনার দান অস্বীকার করা চলে না। সমাজে সব দিকে প্রসারতা না এলে ব্যক্তির মন কখনও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। সে যুগে ধর্মই সমাজে এই প্রসারতার ভাব সৃষ্টি করেছিল। অবিশ্যি এ ধর্ম অন্ধ ক্রিয়াকলাপ বা অনুষ্ঠানের মধ্যে মোটেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ছিল মূলত আত্মিক সাধনার ধর্ম। সব কালে সব সমাজে সত্যিকার বাঁচার মত বাঁচতে গেলে জীবন দর্শন বলে একটা কিছু থাকা চাই। অতীতে এই দর্শনের রূপ ছিল ধর্মগত ; বর্তমানে আমরা বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শনের অধিকারী। যাই হোক শিল্পের ধর্মভাবাপন্ন রূপ হলেও বিষয়বস্তুর নির্বাচনে যে সব ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ব্যাপারের উপর দৃষ্টি রাখা হয়েছে তা মোটেই নয়। চীনা আদর্শে প্রকৃতিতে গাছপালা, তৃণ, জীবজন্তু, মানুষ-এর কোনটাই ধর্মসাধনার বহির্ভূত নয়। চীনা ধর্মসাধকেরা প্রকৃতিকে আলাদাভাবে না দেখে সমগ্র জিনিযটিকে এক করে দেখেছেন।

এজন্যেই চীনা দৃশ্যচিত্রে আমরা পাহাড়-পর্বত, নদী, গাছপালা মোরগ প্রভৃতির এতটা আধিক্য লক্ষ্য করে থাকি। অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষ যেমন বাঁশপাতা কি দুটো চড়াইপাখি নিয়েই শিল্পীরা অজস্র ছবি এঁকেছেন। চীনা শিল্পীসাধকের যে contemplative attitude তার প্রকাশের জন্যই নিরাভরণ সামগ্রীকে অবলম্বন করে তাঁরা অবিস্মরণীয় শিল্প সৃষ্টি করেছেন। জ্যোৎস্না রাতে কম্পমান বাঁশ ঝাড়ের কয়েকটি পাতা সামগ্রীর দিক থেকে অপ্রতুল হতে পারে কিন্তু চীনা শিল্পাদর্শে এটিই শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টির বিষয়।

এইখানে ইউরোপীয় শিল্পের সংগে চীনা শিল্পের তুলনামূলক কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। শিল্পে যে রিয়ালিজম কথাটি ব্যবহৃত হয় তা ইউরোপীয় শিল্পে যেমন আছে তেমনই চীনা শিল্পেও। কিন্তু এ দুয়ের রূপে বিরাট পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রথমত, চীনা শিল্পে প্রকৃতি থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হলেও তা সবসময় আড়ম্বর ও জাঁকজমক বর্জিত সাদাসিদে না। দ্বিতীয়ত চীনা শিল্পে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ছবি আঁকা হলেও শিল্পীর সব সময় দৃষ্টি থাকে মানুষের মনকে বৃহত্তর প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ করার, সৃষ্টি রহস্যের ব্যাপারে তাকে চিন্তাকুল করে তোলার। কিন্তু ইউরোপীয় শিল্পে রিয়ালিজমের অর্থ হচ্ছে কেবলমাত্র দৃষ্টিগত ঔৎসুক্য। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়!

সুঙ বংশের চিত্রের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সন তারিখ এবং শিল্পীর নামোল্লেখ বিশেষ না করে কেবল তত্ত্বগত

আলোচনা করছি। কিন্তু কথা হচ্ছে এছাড়া গত্যন্তর দেখি না। সত্যি কথা বলতে কি চীনা শিল্পে আবেদনগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ছাড়া ঐতিহাসিক দিক থেকে কেবলমাত্র কয়েকটি বংশের নাম করা চলে। আর চীনা শিল্প যখন মূলত ঐতিহ্য-প্রধান তখন এধরণের মন্তব্য যে ভ্রান্ত নয় তা সহজেই বোঝা যায়। তাছাড়া সুঙ বংশের আমল চীনা শিল্পের এক স্বর্ণযুগ হওয়ায় আমাদের এই তত্ত্বগত আলোচনার যৌকিকতা রয়েছে। সুতরাং চীনা শিল্পের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আরো কথা আমরা এখানে বলতে পারি।

এর আগে আমরা বলেছি চীনা শিল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাদাসিদে। কয়েকটি বাঁশ পাতা কি চড়াই পাখী আঁকার জন্য যেটুকু স্থান প্রয়োজন হয় সেটুকুই তো চীনাশিল্পীর ক্যানভাস নয়। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে চীনা চিত্রকলায় শূন্য স্থানের অবকাশ সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। পরম্পরাগত চীনা শিল্পে যে শান্ত, সমাহিত এবং সংযমী দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায় ক্যানভাসে অবকাশ সৃষ্টির মারফত তা সম্ভব করে তোলা হয়েছে। অবিশ্যি শূন্যস্থান যে সব সময় সাদা রাখা হয় তা নয়। উপরে আঁকা কাজগুলিতে গেরুয়া রঙের পটভূমি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে চীনা কালির পরিপ্রেক্ষিতে ফিকে গেরুয়ার তাৎপর্য অদ্ভুতভাবে ধরা পড়ে।

ইউরোপীয় শিল্পের সংগে তুলনামূলক আলোচনায় এলে

আমরা লক্ষ্য করি চীনা শিল্পে দর্শককে মাটি থেকে উঁচু এক স্তরে সংস্থাপন করা হয়েছে। চীনা চিত্রে পাহাড়-পর্বত খরস্রোতা স্রোতস্বিনী-বহুল কাজগুলি দেখলে মনে হয় আমরা পৃথিবীর অনেকটা উপরে উঠে এগুলি দেখছি। দৃশ্যচিত্রে দূরবর্তী আকাশের প্রান্তরেখা দেখানোর প্রয়োজনীয় চীনা শিল্পীরা কখনও অনুভব করেননি। ইউরোপীয় শিল্পে আমরা দেখি প্রত্যেক দৃশ্যচিত্রে দূরে সমান্তরাল রেখার দ্বারা আকাশের প্রান্ত সুপরিস্ফুট করা হয়েছে। তাছাড়া আকাশ ও মাটির যে তফাৎ, সে ব্যাপারে স্বাভাবিকতা সৃষ্টির জন্য আকাশের প্রান্তরেখার অনতিদূরে গাছপালা, পাহাড় প্রভৃতিকে আঁকাবাঁকাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। পরম্পরাগত চীনা শিল্পী তাঁর সাধক মনের ভাবকে প্রাধান্য দেওয়ায় দৃশ্যচিত্রে স্বাভাবিকতা সৃষ্টির প্রতি মোটেই আমল দেননি। চীনারা পাহাড়-পর্বত নদী-নালা নিখুঁতভাবেই এঁকেছেন কিন্তু তা শুধু প্রকৃতিকে বাইরের থেকে দেখার জন্য নয়। বরং প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্কের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চেতনাকে বিশ্ব জীবনে পরিব্যাপ্ত করাই থেকেছে তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় শিল্পে আমরা দেখি যে দৃশ্যচিত্রে চোখটাই সব—মনটা গৌণ। তাছাড়া চোখকে প্রাধান্য দেওয়ায় অনেক সময় দৃশ্যচিত্র নানা খুঁটিনাটিতে ভারাক্রান্ত।

সুঙ বংশের শিল্পীদের মধ্যে দৃশ্যচিত্র আঁকায় সবচেয়ে দক্ষতা অর্জন করেন মা য়ুয়ান এবং মিয়া কুয়েই। অবিশ্যি সুঙ আমলে

শুধু যে দৃশ্যচিত্র আঁকা হয়েছিল তা মোটেই নয়। সাধু ও কবিদের প্রতিকৃতি, ইতিহাসের নানা ঘটনা এবং অন্যান্য মূর্তিপ্রধান চিত্র আঁকা হয়েছে। এক কথায় সুঙ বংশের আমল চীনা শিল্পের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট এবং অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রেরণার যুগ।

সুং বংশের পর চীনা শিল্পের ধারায় আমরা যথাক্রমে য়ুয়ান ও মিঙ বংশের সাক্ষাৎ পাই। এই যুগ দুটি সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই না। কারণ এই যুগদুটিতে শিল্পের নতুনতর কোন রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিম্বা তাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করারও কোন প্রচেষ্টা হয়নি। টাঙ বা সুঙ আমলে শিল্পের যে মানদণ্ড স্থিরীকৃত হয়েছিল পরবর্তী যুগদুটিতে অনেক সময় তারই পুনরাবৃত্তি বা অনুকৃতি লক্ষ্য করা গেছে। এই যুগ দুটির একমাত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সজ্জার দিক থেকে ফুলজাতীয় নানা ধরণের নক্সার প্রবর্তন। পরবর্তীকালের এই নক্সার বহু নমুনা ইউরোপে আমদানি করা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে চীনা শিল্পের যে বিরাট ঐতিহ্য যা টাঙ ও সুঙ আমলে গড়ে উঠেছে—সে পরিপ্রেক্ষিতে এ জিনিষটি অতি নগণ্য স্থান জুড়ে আছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চীনা চিত্রকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসগত পরিচয় দিয়েছি। এর মধ্যে যেক'টি বিশিষ্ট যুগের কথা আলোচনা করা হয়েছে তাছাড়া চীনের চিত্রকলার অন্য ঐতিহাসিক যুগগুলির আলোচনার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কারণ
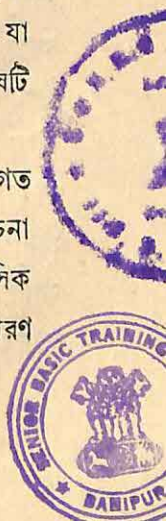
চীনা চিত্রকলার মূল বিকাশ টাঙ, সুঙ ও মিঙ আমলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর পরের যুগগুলিতে পূর্ববর্তী যুগের শিল্পাদর্শকেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে নতুন কিছু শিল্পরীতি প্রবর্তন করা হয়নি। আধুনিক কাল পর্যন্ত চীনা চিত্রকলার ধারা এই-ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সম্প্রতি অবিশ্যি এই অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চীনে জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এই পরিবর্তনের কারণ। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে প্রাচীন চীনা চিত্রকলায় মানুষের উপস্থিতি কম লক্ষ্য করা যায় এবং প্রকৃতি প্রাণীজগতের রূপায়ণই বেশী করে চোখে পড়ে। চীনা চিত্রকরেরা ছিলেন একাধারে শিল্পী ও সাধক। শিল্পসৃষ্টি জিনিষটা ছিল তাঁদের কাছে আত্মিক উন্নতি ও পারমার্থিক জ্ঞানলাভের সহায়কবিশেষ। তাই তাঁরা নিজেকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রকৃতি ও প্রাণী জগতে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিতে চাইতেন। আত্মিক বিকাশ সম্পর্কে চীনা শিল্পীদের এই ধারণা ছিল তাও ও কন্‌ফুসিয়াস প্রবর্তিত ধর্ম সাধনারই অংশ। আর আমরা জানি তাও ও কন্‌ফুসিয়াসের মতবাদ চীনা সমাজের উপর বহুকাল প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। কিন্তু সম্প্রতি চীনে কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, শিল্প বিস্তার ও সমাজ বিকাশ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারার প্রসার প্রভৃতির ফলে চীনাদের প্রাচীন বিশ্বাস বদলাতে আরম্ভ করেছে। এইজন্যই সাম্প্রতিক চীনা চিত্রকলায় আমরা চারপাশের জীবনের আরো বাস্তব রূপায়ণ লক্ষ্য করছি। অবিশ্যি প্রাচীন চীনা চিত্রকলা

যে বাস্তবধর্মী ছিল না আমি তা বলছি না। তবে তখনকার দিনে শিল্পীরা প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে গিয়ে সব কিছু বাদ দিয়ে তাঁর আত্মিক সাধনালব্ধ ভাবের উপযোগী করে কেবল পাহাড় বা নদীকে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু এখন আর হুবহু এই ধারণা বজায় থাকছে না। উদাহরণ স্বরূপ হালের আঁকা তিব্বতের জীবনযাত্রার উপর চীনা শিল্পীদের ছবির কথা উল্লেখ করা যায়। চীনা মূল ভূখণ্ডের সংগে তিব্বতের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর সৌহার্দ্যের চিহ্নস্বরূপ চীনা শিল্পীরা এই ছবি এঁকেছেন। এখানে তিব্বতের জীবনধারার চমৎকার একটা আলেখ্য পাই। অথচ এই ছবিগুলি আঁকতে গিয়ে চীনারা তাঁদের প্রাচীন শিল্প পদ্ধতিকে মোটেই পরিত্যাগ করেননি অর্থাৎ ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায় এগুলি চীনা। এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। চীনা ছবিতে আজকাল মানুষকে আমরা পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছি। সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর একভাবে চলে আসার পর আজকের চীনা জীবন অদ্ভুত কর্ম-মুখর ও আমূল পরিবর্তনের সম্মুখীন। সুতরাং চিত্রে মানুষের উপস্থিতিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে চীনা শিল্পীরা প্রথমত পাহাড়-নদী-গাছপালা-জীবজন্তুর রূপায়ণকে মোটেই পরিত্যাগ করেননি। চিত্রে বর্তমান অবস্থার উপযোগী নতুন বিষয়বস্তু তাঁরা আনছেন বটে কিন্তু অঙ্কন পদ্ধতি ও ভাবগাম্ভীর্যের দিক থেকে ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করে চলেছেন। তাই বর্তমানের চীনা ছবির সংগে অতীত সৃষ্টির যোগ খুবই নিবিড়।

ভাস্কর্য

চিত্রকলার মত চীন দেশে ভাস্কর্যের ঐতিহ্য তেমন ঐশ্বর্য-মণ্ডিত নয়। এদিক থেকে চীনে ঠিক ভারতবর্ষের বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় শিল্পের ধারায় স্থাপত্য নির্ভর ভাস্কর্যের অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় আমাদের শিল্পের ঐতিহ্য ভাস্কর্যনির্ভর। সে তুলনায় চিত্রকলার ক্ষেত্রে এতটা ব্যাপক সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় না। অবিশ্যি একথা মনে রাখতে হবে দুইদেশেই শিল্পের বিকাশ ঘটে ধর্মকে কেন্দ্র করে। আর ধর্মের এই প্রভাবের ব্যাপারে দেখি বৌদ্ধ শিল্পাদর্শ চীনা শিল্পের উপর গভীর রেখাপাত করেছে। যাই হোক ভারত ও চীনের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ বোধ হয় জাতীয় পছন্দের উপর নির্ভরশীল! চীনারা চিত্রকলার মারফৎই তাদের সৌন্দর্যবোধকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। চীনাদের যে সূক্ষ্ম অথচ সজীব এবং কাব্যময় অনুভূতি তা রঙ আর তুলিতেই ধরা পড়েছে।

ইউরোপে ভাস্কর্যের গড়নে স্বাভাবিকতাটাই হচ্ছে মূল আদর্শ। যাঁরা ভাস্কর তাঁদের সব সময় দৃষ্টি থাকে মূর্তির মারফৎ বাস্তব জগতের আকার ও গতিকে ধরে দেওয়ার প্রতি। প্রকৃত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ভাস্কর্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য যাচাই করা হয় যদিও তা একেবারে বাস্তবের হুবহু নকল নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মানুষের গড়নই হচ্ছে শিল্পীর কাছে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত এবং সৌন্দর্য ও ইন্দ্রিয়সম্ভূত জীবনের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা। এথেকে বোঝা যায় পাশ্চাত্যের ভাস্করেরা মূর্তিনির্মাণে সাধারণীকৃত কোন রূপকে আমল না দিয়ে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। চীনদেশে কিন্তু আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের প্রচলন লক্ষ্য করি। মানুষের দেহগত গড়ন চীনা শিল্পীর কাছে মোটেই আকর্ষণের বস্তু নয়। অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব আকার বা গতিকে তাঁরা সৌন্দর্যের একমাত্র মানদণ্ডরূপে আমল দেননি। ভাস্কর্যে তাঁরা বিশেষকে গৌরবের স্থান না দিয়ে নির্বিশেষ আধ্যাত্মিক বিষয়কে পরিস্ফুট করেছেন। এখানে ভাস্করের মনোগত ধারণাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যদিও বাস্তব জগৎ থেকে Image বা প্রতীক আহরণ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের মত চীনাদের ভাস্কর্যকলাও: অত্যন্ত ব্যবহারসিদ্ধ। মূর্তিনির্মাণে একবার যে নীতি নির্ধারিত হয়েছিল পরবর্তীকালে শিল্পীরা নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার আশায় সেই পরম্পরাগত ধারাকে পরিবর্তন করার বিশেষ চেষ্টা করেন নি। তাই ভারতের

মতই ভাস্কর্যের যাঁরা স্থষ্টিকর্তা তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় অজ্ঞাত। মূর্তি কিভাবে তৈরী করা হবে সে বিষয়ে আমাদের দেশে শিল্প-শাস্ত্রের প্রচলন ছিল। আর আমাদের ঐতিহ্যপ্রধান শিল্প স্থষ্টিতে শিল্পীরা সব সময়ই সেই শাস্ত্রকে মেনে এসেছেন। চীন দেশেও এই ধরণের শিল্পশাস্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভাস্কর্যে যেহেতু ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য স্থষ্টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং মনোগত উপলব্ধিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেই হেতু শিল্পীরা মূর্তির যে ভাব তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত মূর্তি থেকে অন্যান্য অগণিত দর্শকদের মনে যাতে যথাযথ ভাবের উদ্রেক হয় সেদিকেই দৃষ্টি রাখা হোত। যেমন ভারতে তেমনি চীনে ধর্মের প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাস্কর্যগুলি তো ব্যক্তিগত উপভোগের বিষয় ছিল না—ছিল সর্বজনের সামগ্রী। আর সেইজন্যে শিল্প-শাস্ত্রের নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। ইউরোপে কিন্তু এ জিনিষ মোটেই লক্ষ্য করা যায় না। এখানেও অবিশ্যি ধর্মের জন্য শিল্পকে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন মধ্যযুগে ক্রিশ্চিয়ান চার্চের শিল্পকলা। কিন্তু এটা ইউরোপীয় শিল্পের একটা অংশমাত্র। ইউরোপে ভাস্কর্য প্রধানতঃ ধর্ম-বহির্ভূত ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রীক স্থাপত্যে দেখা যায় মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যের বিজয় ঘোষণা। ফিউডাল সমাজে দেখা যায় রাজ-রাজড়াদের প্রতিকৃতি। বুর্জোয়া সমাজে রোঁদা (Rodin) প্রমুখ শিল্পীদের কাছে একান্ত ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালবাসা, হতাশা-নিরাশার

বাণী পরিস্ফুট হয়ে উঠল। একেবারে আধুনিককালে হেনরি-মুরের সৃষ্টিতে আমরা ব্যক্তির অবচেতন মনের প্রকাশ লক্ষ্য করছি। একমাত্র চার্চ শিল্প ছাড়া ইউরোপীয় ভাস্কর্য কখনও ব্যবহারসিদ্ধ রূপ গ্রহণ করেনি।

চীনা ভাস্কর্যে উল্লেখযোগ্য মূর্তি হচ্ছে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের। এই মূর্তিগুলির প্রত্যেকটিরই সাঙ্কেতিক তাৎপর্য রয়েছে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে বিভিন্ন পর্যায় সেই অনুসারে এই তাৎপর্য নির্ণীত হয়েছে। বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের মূর্তি আসল বুদ্ধের প্রতিকৃতি মোটেই নয়। তা কোন সাধারণ মানুষেরও মূর্তি নয়। সংযম ও সাধনার দ্বারা মানুষ প্রাচীনকালে যে ভাবে নিজকে ধাপে ধাপে ঐশ্বরিক করে তোলার চেষ্টা করেছিল মূর্তিগুলি তারই প্রকাশ। আর এগুলিকে বোধগম্য করার জন্যই শিল্পীকে শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলতে হয়। অনেকে একথা বলতে পারেন এ অবস্থায় শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে কিছু বজায় থাকেনা। আমরা আগেই বলেছি চীনা চিত্রকর বা ভাস্করদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন শিল্পী সাধক। তাছাড়া যারা ছিলেন অশিক্ষিত তাঁরাও মূর্তি রচনার ক্ষেত্রে ধর্মভক্তির দ্বারা পরিচালিত হতেন। অবিশ্যি একথা মনে রাখতে হবে ভাস্করেরা যে সব সময় নিখুঁত নিয়ম মেনে চলতেন তা মোটেই নয়। মূল কাঠামো বজায় রেখে মূর্তির গড়নের অল্প অদল বদল কিম্বা পোষাকের হেরফের করা হোত। যাই হোক সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সাধারণ লোক শিল্পশাস্ত্রের

খুঁটিনাটি নিয়ম' না জানলেও এই সমস্ত মূর্তির উপভোগ থেকে মোটেই বঞ্চিত হোত না। আমাদের নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করা যায়। যেমন ইলোরা, কোনারক কিম্বা মহাবালী-পুরমের যে ভাস্কর্য তা প্রত্যেক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, এর জন্যে শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম জানতে হয় না। মূর্তির দাঁড়াবার বিভিন্ন ভঙ্গী আছে, হস্তের নানা মুদ্রা আছে, মুখভঙ্গীরও নানা তারতম্য আছে যা হচ্ছে শিল্পশাস্ত্রের বিষয়। কিন্তু সাধারণ দর্শক দেখে মূর্তির সমগ্র রূপটি। আর শিল্প ঐতিহ্যপ্রধান এবং সামাজিক সৃষ্টি হওয়ার দরুণ শিল্পের উপভোগে কোন অসুবিধা হোত না। চীনা শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিতে নির্বিশেষ ভাবকে কতটা সার্থকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সে বিচার আমরা করতে পারিনা। কারণ তা নির্ভর করে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের স্থান কি, সে সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পোষণ করি তার উপর। আর এ শিল্পের বিচার একমাত্র আঙ্গিকের দিক থেকেও করা চলে না। তবে এ জিনিষ যে একদিন সমাজের বিপুল জনসমষ্টিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা থেকেই এর অবিনশ্বরতা প্রমাণিত হয়।

উপরে যে মন্তব্য করা হল তা কেবল মাত্র চীনের ধর্মসংক্রান্ত মূর্তিগুলির সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এগুলি ছাড়াও চীনে আধা-ধর্মগত ও লৌকিক ভাস্কর্যও চোখে পড়ে। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে একদিকে যেমন অত্যন্ত অপ্রচলিত বা পুরাতন গড়ন দেখা যায় অন্যদিকে তেমনি

জাকজঁমকপূর্ণ কাজও লক্ষ্য করা যায়। এগুলি বিভিন্ন জিনিষ যেমন কাঠ, পাথর কি ধাতুর তৈরী। এই সমস্ত প্রাণীর মূর্তিগুলি বৌদ্ধ মূর্তির মত কোন শিল্পশাস্ত্রের নিয়মে গ্রথিত নয়। গড়ন ও গতিকে পরিস্ফুট করে তোলার ব্যাপারে এখানে শিল্পীদের অনেকটা স্বাধীনতা বজায় ছিল। তবে এগুলি যে ইউরোপের মত বাস্তবের হুবহু প্রতিরূপ তা মোটেই নয়। সাধারণ অর্থে আমরা যাকে 'ন্যাচারালিষ্টীক' মূর্তি বলি এগুলি সেই পর্যায়ে পড়ে না। বেশীর ভাগ মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয় তাদের অবস্থিতি দৃশ্যজগতে নয় এবং প্রত্যেকটিরই আবার সাঙ্কেতিক তাৎপর্য রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রাণীরই এক একটা বিশেষ দিক যথা হিংস্রতা, সাবধানতা, ক্ষমতা কিংবা চঞ্চলতার বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা দেখে মনে হয় এরা ঠিক বাস্তবের প্রতিরূপ নয়। অবিশ্যি বৌদ্ধ মূর্তিগুলি যে কারণে সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিশিষ্ট এগুলি ঠিক সে কারণে নয়। কারণ এখানে যে ভাব প্রকাশিত তা একান্ত ভৌতিক বা প্রাণী জগতের যা প্রাকৃতিক নিয়মেরই অংশবিশেষ। এই সমস্ত প্রাণীমূর্তি আমাদের দৃষ্টিকে সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে টেনে নিয়ে যায় বলেই এগুলি শিল্প-পর্যায়ভূক্ত।

মৃৎপাত্র

মৃৎপাত্রের প্রচলন পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই লক্ষ্য করা যায়। মৃৎপাত্রে লোকশিল্পীর প্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ ঘটেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ গ্রাম্য শিল্পীর মাটির প্রতিই থাকে স্বাভাবিক আকর্ষণ। এত সহজে রূপসৃষ্টির অন্য কোন মাধ্যম চোখে পড়ে না। মৃৎশিল্পে পাত্রের গড়নটা প্রথমে সকলের দৃষ্টিকে অভিভূত করে। আর এই গড়নের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সীমা পরিসীমা চোখে পড়ে না। দু'চারটি ভঙ্গীর উপস্থিতি একটি জিনিষে একেবারেই অনুপস্থিত। এখানে ভঙ্গী একটিই এবং তার অভিনবত্বেই সমগ্র কাজটির অভিনবত্ব। মাটির তাল থেকে অবিশ্যি রূপসৃষ্টির অভূতপূর্ব সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু তাই বলে এখানে শিল্পী যা খুসী তাই একটা গড়নকে প্রাধান্য দিতে পারেন না। এ ব্যাপারে তাকে রীতির অনুশাসন কিছুটা মানতে হয়, তাছাড়া আকারকেও অত্যন্ত সংযতভাবে প্রকাশ করতে হয়।

মৃৎশিল্পের সংগে ভাস্কর্যের অনেকটা গুণগত সম্পর্ক বর্তমান।

ভাস্কর্যের যে plastic বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা সচরাচর আলোচনা করে থাকি তা মৃৎশিল্পেও উপস্থিত। কোন মাটির পাত্র তা হাতে তৈরীই হোক কিম্বা চাকার সাহায্যে তৈরী হোক তার এই plastic বৈশিষ্ট্য সব সময়ে চোখে পড়ে। মডেলিং, যা ভাস্কর্যের একটা মূল বিষয়, তা মৃৎপাত্রের গায়েও প্রতীয়মান। বক্ররেখার মাধুর্যকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে চীনা মৃৎশিল্পীরা অদ্বিতীয়। এজন্য ভাস্কর্যে যে সযত্ন ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় তা মৃৎপাত্রকেও প্রভাবিত করেছে। ভাস্কর্যের সংগে সাদৃশ্য ছাড়াও রঙের দিক থেকে মৃৎপাত্রের আবেদন কম উপভোগ্য নয়। এখানে গড়ন জিনিষটা মূল বিষয় হলেও রঙের চমৎকারিত্ব এই সমস্ত সামগ্রীতে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। পাত্রের গায়ে যে উজ্জ্বল বার্ণিশ লাগানোর রীতি প্রচলিত আছে তাতে সাধারণত একটি রঙ প্রয়োগ করা হলেও রঙের বৈচিত্র্যসৃষ্টিরও যথেষ্ট সুযোগ বর্তমান আছে। অনেক সময় শিল্পীর বিশেষ নৈপুণ্যের দরুণ একটি রঙ নীল কি সবুজের আভা পাত্রের গা থেকে এমনভাবে বিচ্ছুরিত হয় যে তা মনে হয় কোন বিশেষ ধরণের পাথরে তৈরী।

খৃষ্টীয় যুগের আরম্ভ অর্থাৎ হান্ বংশের আমল থেকে চীনদেশে সত্যিকার শিল্পসম্মত মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এর আগে চীনে মৃৎশিল্প বলতে কিছু ছিল না তা মোটেই নয়। এই সময়কার সামগ্রীগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক (primitive)

আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর মূল্য একমাত্র মানব-জাতিতত্ত্বের বিবরণ হিসাবে। ঐতিহাসিক যুগে যেমন উজ্জ্বল বার্ণিশ করা পাত্র দেখা যায় এযুগে সে পদ্ধতি ছিল একান্ত অপরিচিত। পাত্রগুলি ছিল ছাইরঙের যদিও তার গড়নে ছিল শুদ্ধগাম্ভীর্যের ছাপ। খৃষ্টপূর্ব যুগে চীনদেশে না হলেও পশ্চিম এশিয়া, ঈজিপ্ট এবং গ্রীসে মৃৎশিল্পের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। চীন দেশে এই সময়ে ব্রোঞ্জের ব্যবহারও খুবই প্রসার লাভ করে। তাই দেখা যায় খৃষ্টযুগের আরম্ভে হান্ আমলে চীনে যখন মৃৎশিল্পের সত্যিকার সমৃদ্ধি ঘটে তখন তার উপর পশ্চিমের প্রভাব এবং ধাতুর টেকনিকের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। চীনদেশে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের মধ্যে মৃৎশিল্পের কাজগুলি যতটা সহজলভ্য তা আর কিছু নয়। এগুলি আকারে ছোট হওয়ার দরুণ পাশ্চাত্য দেশে প্রচুর রপ্তানী হয়েছে। আর আমরা জানি পাশ্চাত্যদেশেই একমাত্র চীনাশিল্পের চর্চা সবচেয়ে অগ্রসর। শুধু যে এই জিনিষগুলি ইউরোপে আনীত হয়েছে তাই নয় ঐ দেশের মৃৎশিল্পীরা—যেমন ডাচ ও জার্মাণ শিল্পীরা—অনুপ্রাণিত হয়ে চীনের অনুকরণে পাত্র তৈরী করেছেন। চীনের এই নিদর্শন-গুলি থেকে আমরা বিভিন্ন সময়ে ঐ দেশের চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে থাকি। এ তুলনায় চীনের স্থাপত্য বা ভাস্কর্যকে অনুধাবন করার তেমন সুযোগ বজায় নেই। চিত্রকলা অনেকটা আমাদের পরবর্তী কপির সাহায্যে জানতে হয়।

৩নং চিত্র

৪নং চিত্র

ব্রোঞ্চ ও অন্যান্য ধাতুর কাজগুলি অত্যন্ত টেকনিকপ্রধান হওয়ায় চীনা শিল্পের উপভোগে তেমন সুবিধা হয় না।

চীনের চিত্রকলা কিম্বা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা হান, টাঙ, সুঙ, য়ুয়ান, সিঙ প্রভৃতি বংশের যুগ লক্ষ্য করে থাকি। চীনদেশের মৃৎশিল্পের যে উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি আজ সকলের দৃষ্টিগোচর তা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরী হয়নি। টাঙ বা সুঙ আমলে দেখা যায় এগুলির ব্যবহার একমাত্র সম্রাট ও সম্রাট পরিবার এবং এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্টসূত্রে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মৃৎপাত্রগুলি নানা রঙের উজ্জ্বল বার্ণিশ এবং অলঙ্করণ সংযুক্ত হওয়ায় মূল্যবান সামগ্রী হয়ে দাঁড়াতো। সাধারণ লোকের পক্ষে এগুলির নাগাল পাওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। রাজ পরিবারের লোকেরা তাঁদের ইহজীবনে পাত্র-গুলিকে ব্যবহার করে সন্তুষ্ট হতেন না; পরকালেও তা তাঁদের সাথী হোত। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কবরস্থানে বিশেষ কক্ষে এগুলি সংরক্ষিত থাকতো। উদ্দেশ্য ছিল মৃত ব্যক্তির পরকালের যে জীবন তাতে যেন কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। এর আগে অবিশ্যি আমরা দেখেছি কবরস্থানে শুধু মৃৎপাত্রই রাখা হোত না মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন প্রভৃতিরও প্রতিমূর্তি সংরক্ষিত হোত। আধুনিক যুগে চীনের প্রাচীনকালের মৃৎশিল্পের চমৎকার নিদর্শন সমষ্টি এই সমস্ত খবর খুঁড়েই বার করা হয়েছে। এর আগে আমরা বলেছি যে মৃৎশিল্প হচ্ছে

লোকশিল্পেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। গ্রামের শিল্পীরা তাঁদের কুটীরে বসেই কাজ করতে পারেন। কিন্তু রাজ পরিবারের চাহিদা বেশী এবং উন্নত ধরণের হওয়ায় বিভিন্ন রাজ বংশের আমলে চীনের বিভিন্ন স্থানে ফ্যাক্টরির ভিত্তিতে চুল্লী (kiln) গড়ে ওঠে। কোন কোন চুল্লীর উৎপাদিত সামগ্রী এতটা শিল্পসম্মত হোত যে তা সমস্ত চীনে সেই চুল্লীর নামানুসারে খ্যাতি লাভ করেছিল। সেই সমস্ত চুল্লীর ভগ্নাবশেষ এখনও চীনের নানাস্থানে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কালে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রগুলির নির্মাণ স্থান ও কাল বহুক্ষেত্রে এই সমস্ত চুল্লীর ভগ্নাবশেষের নিদর্শন মিলিয়ে নির্ণয় করা হয়েছে। কারণ প্রাচীন কালের এই চুল্লীর আশপাশে সম্পূর্ণ না হলেও বহু পাত্রের ভাঙা অংশ পাওয়া গেছে। তু' একটি চুল্লীর নাম এখানে করা যেতে পারে যেমন য়ু-ইয়াও, অল্টার (হ্যাংচাউ), লুঙচুয়ান (চেকিয়াং), চিং-তে-চেন (কিয়াংসু) ইত্যাদি। বর্তমানে কিয়াংসি, হোনান প্রভৃতি প্রদেশে উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্পের কেন্দ্র লক্ষ্য করা যায়। আমরা আগেই বলেছি টাঙ এবং সুঙ আমলে মৃৎপাত্রের ব্যবহার রাজপরিবার এবং ধনিকশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনা-ডাচ বাণিজ্যের বিস্তৃতির সংগে সংগে ওলন্দাজদের মধ্যে চীনা মৃৎপাত্রের চাহিদা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। ওলন্দাজদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল রঙ করা চীনা মাটির বাসনগুলির (porcelain) প্রতি। চীনারাও এই সুযোগ গ্রহণে কার্পণ্য

করেনি। ফলে এই সময়ে ইউরোপে চীনা মৃৎপাত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। ওলন্দাজরা ছাড়াও ইউরোপের কয়েকজন নৃপতি চীনা মৃৎশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি সংগ্রহের প্রতি উৎসাহ দেখান। ফরাসীদেশের চতুর্দশ লুই ছিলেন এবিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী।

চীনা মৃৎপাত্রের রঙের মাধুর্যের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু নানা বর্ণের উজ্জ্বল বার্ণিশের মধ্যেই মৃৎপাত্রের সবটুকু সৌন্দর্য সীমাবদ্ধ থাকে নি। পাত্রের গায়ে বিভিন্ন ধরণের ছবি আঁকার রীতিরও প্রচলন দেখা যায়। সুঙ আমলেই এই রীতির উদ্ভব হয়। চীনা মৃৎশিল্পে অবিশ্মি রঙের সার্থক প্রয়োগ সুঙ-পরবর্তী মিঙ রাজবংশের আমলেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে বিষয়বস্তুর শুধু মূল কাঠামোটাই আঁকা হোত, খুঁটিনাটি কাজের প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হোত না। ভিক্টোরিয়া এলবার্ট মিউজিয়মে সংরক্ষিত সুঙ মৃৎপাত্রে দেখি মাছ কিংবা লতাগুল্মের বাইরের আকারটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পরবর্তী যুগগুলিতে এ ব্যাপারে আরো খুঁটিনাটি এবং সত্যিকার চিত্রধর্মী কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। চীনারা আসলে শিল্পীর জাত। চিত্রকলার মাধ্যমেই তাঁদের সেই স্বভাবের বিশেষ প্রকাশ। চীনাদের এই চিত্রধর্মী মনের ছোঁয়াচ তাঁদের বেশীর ভাগ শিল্পকর্মকেই স্পর্শ করেছে। এরপর আমরা সূচীবস্ত্রের কাজ নিয়ে আলোচনা করব এবং সেখানেও দেখা যাবে একই জিনিষ। চীনাশিল্পীর কাছে মৃৎপাত্রের বাইরের

অংশ ছবির ক্যানভাসের মত। যেমনিভাবে তাঁরা কাগজের উপর ছবি আঁকেন তেমনি অবলীলাক্রমে তাঁরা মৃৎপাত্রের গায়ে কাজ করেছেন। অথচ ছবি আঁকার দিক থেকে দুটিই সম্পূর্ণ আলাদা মাধ্যম। সাদা ক্যানভাস, যার উপর ছবি রূপ ধারণ করে তা সমতল। কিন্তু মৃৎপাত্রের আকার আছে। এর প্রকৃত পারম্পর্য (perspective) বজায় রেখে ছবি আঁকা আর সমতল ক্যানভাসে ছবি আঁকা এক জিনিষ নয়। অথচ চীনা শিল্পীরা কাগজ বা সিল্কের উপর যে বিষয় এঁকেছেন ঠিক সেই জিনিষই তাঁরা মৃৎপাত্রের গায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ছবির যে গুণাগুণ তা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থেকেছে। বরং আকারবিশিষ্ট পাত্রের গায়ে অঙ্কিত হওয়ায় তা আমরা নতুনভাবে উপভোগ করতে পারি। একস্থানে দাঁড়িয়ে দেখলে পাত্রের সমস্ত ছবিটা একসঙ্গে চোখে পড়ে না কিন্তু ঘুরিয়ে দেখলেই তা পরিষ্কার চোখে পড়ে। চীনারা শুধু জল থেকে লাফ দেওয়া মাছ, কিম্বা ফুলপাতা, নয় সম্পূর্ণ দৃশ্য পাত্রের গায়ে রূপ দিয়েছেন। কাংসি আমলের (১৬৬২-১৭২২) একটি ফুলদানীর আকারের পাত্রে দেখা যায় রাস্তার দৃশ্য। দুপাশে দুটি বাড়ীর বারান্দার সামনের অংশ। এক ধনী ব্যক্তিকে রিক্সার মত গাড়ীতে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটি বারান্দার উপর কয়েকজন মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার এদিক-সেদিকে গাছপালা মাটির ঢিপি ছড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত পরিকল্পনাটি এমন সুন্দর যে মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা ছবির চেয়ে মনে হয়

যেন জীবন্ত দৃশ্য। আরেকটি জলপাত্রের চারিধারে নদী বা হ্রদের তলাকার জীবজন্তু ও গাছপালাগুলি অত্যন্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে। আরো অনেক উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে। জলপাত্রে উড়ন্ত ড্রাগনের চিত্র, ফুলদানীতে চারটি মহিলার পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি সমেত সিল্কের কাপড় পরীক্ষার দৃশ্য, চীনামাটির প্লেটে ঘরের অভ্যন্তরে একটি পরিবারের দৃশ্য ইত্যাদি।

এই কাজগুলি দেখলে আমাদের দুটি জিনিষ সহজেই মনে আসে। একটি হচ্ছে মৃৎপাত্রকে অলঙ্কৃত করার ব্যাপারে অদ্ভুত টেকনিকগত দক্ষতা। চীনারা কারিগরি বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। তাঁদের শিল্পসৃষ্টির সবটাই ক্র্যাফট্ বিশেষ। তাঁরা শিল্পরচনার ক্ষেত্রে শুধু যে কল্পনা আর ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হন একথা চিন্তা করলে ভুল করা হবে। চিত্রকলার অধ্যায়ে আমরা দেখেছি চীনাদের ছবি আঁকা শেখার আগে তাঁদের হাতের লেখা সুন্দর করতে হয়। শিল্পের অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা। এই কারিগরি দক্ষতার জন্যই চীনা শিল্প এতটা বিস্ময়কর। দ্বিতীয়ত, চীনা মৃৎপাত্রের চমৎকার নিদর্শনগুলি দেখলে মনে হয় পাত্র হিসাবে এগুলির সৃষ্টি নয়। অবিশ্যি একথা ঠিক এই পাত্রগুলি যে সবক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োজনে তৈরী করা হয়েছে তা মোটেই নয়। বরং বেশীর ভাগ সময়েই তা হয় নি। রাজপরিবার কিম্বা ধনীর গৃহে গৃহসজ্জারূপেই এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এবং চীনারা তাঁদের স্বাভাবিক শিল্পদৃষ্টি ও কারিগরি দক্ষতার গুণে এগুলিকে সার্থকগৃহসজ্জার

বস্তুতে পরিণত করেছেন। পাত্রগুলি অদ্ভুত মনোরম আকার আর সুদৃশ্য অলঙ্করণ এ দুয়ের সমন্বয়ে কবিতার দ্যুতিময় মাধুর্য অর্জন করেছে

বয়নশিল্প

চীনা গণরাষ্ঠ প্রতিষ্টার পর গত তু'তিন বছরের মধ্যে কলকাতায় ছোট বড় কয়েকটি চীনা শিল্পকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই একটা প্রদর্শনীর কথা বলছি। চীনা শিল্পের নানাবিভাগের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়েছে তা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছি। চীনাদের শিল্প সম্পর্কে ধারণা এতটা চমৎকার যে সাধারণ এক প্রাচীরপত্র তাকেও তাঁরা অদ্ভুত নৈপুণ্যে রূপমণ্ডিত করে তুলেছেন। যতই দেখছি ততই বিস্ময় বাড়ছে। চিত্রকলার বিভাগে এসেছি। চীনারা চিত্রকলাতেই সবচেয়ে সিদ্ধহস্ত সে কথা আগে জানিয়েছি। সুতরাং এই বিভাগে আনন্দের খোরাক অপরিমেয়। কিছু ছবি দেখার পর একজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'এগুলি কি বলুন দেখি ?' আমি একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখছিলাম বলেই আমাকে হয়ত এ প্রশ্ন করা হোল। আমি একটি বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললাম: 'কেন চিত্রকলা!' তিনি বললেন:

'না, এগুলি সূচীবস্ত্রের নিদর্শন'। বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু কাজগুলির খুব নিকটে গিয়ে দেখি সত্যই তাই। সেলাইয়ের ফোঁড় এমনইঃ সুক্ষ্ম আর পরিপাটি যে দূর থেকে দাঁড়িয়ে মোটেই বলা অসম্ভব না যে এগুলি হাতে আঁকা ছবি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে চিত্রকলা আর সূচীবস্ত্রের কাজগুলির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বর্তমান। আমরা জানি তুলিতে রং ব্যবহার এক জিনিষ আর সেলাই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিষ। এ থেকেই চীনাদের শিল্পদক্ষতার ব্যাপারটা আর একবার প্রমাণিত হয়। আর শুধু বিষয়বস্তু বলি কেন চিত্রকলায় যে shadingএর নীতি অর্থাৎ এক রং থেকে ক্রমশ ভিন্ন এক রঙে যাওয়া তারও হুবহু রূপায়ণ সূচীবস্ত্রে উপস্থিত। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, রঙের মিশ্রণের নীতি যা তুলিকেও অনেক সময় এড়িয়ে যায় তাকে সূচীশিল্পে সার্থকভাবে ধরে দেওয়া হয়েছে। সূঁচের ফোঁড়ে এ কাজ করা অপরিসীম ধৈর্যের পরিচায়ক। আমরা তো জানি ভারতবর্ষে খুব কম শিল্পীই—যাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অন্যতম—রঙের মিশ্রণে সত্যকার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ পশ্চাত্যের কথা বাদ দিয়ে প্রাচ্যে প্রত্যেক শিল্পীরই কাম্য হচ্ছে রঙের এই রহস্য উদ্ঘাটিত করা। যাই হোক চীনে সূচীশিল্পের কাজ প্রধানত সিল্কের উপরই করা হয়ে থাকে। চীনদেশ সিল্কের উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। যেখানে এর ব্যবহারও অত্যন্ত ব্যাপক ঃ—অনেকটা জাতীয় পর্যায়েও বলা চলতে পারে। চীনারা সিল্কের উপর

ছবি এঁকেছেন এবং সে বিষয়ে তাঁরা অদ্ভুত পারদর্শী। প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে এই পদ্ধতি অজানা না হলেও চিত্রশিল্পের ভাণ্ডারে এটি চীনাদেরই দান। সিল্কের সংগে চীনাদের আত্মিক সম্পর্ক এবং তারই পরিচয় পাওয়া যায় চিত্রকলা আর সূচীশিল্পের ক্ষেত্রে।

আমাদের এই অধ্যায়টি হচ্ছে বয়নশিল্প সম্পর্কে অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে আমরা textile বলে থাকি। সূচীবস্ত্রের কাজ এই শিল্পেরই একটা অংশ। এ ছাড়া বুটীদার কাপড়, হাতে তোলা বিবিধ চিত্রবিশিষ্ট পরদা, গালিচা, মখমল ইত্যাদিও আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। চীনদেশে বয়নশিল্পের এই ধরণের প্রত্যেকটি বিভাগেই যথেষ্ট সমৃদ্ধ কাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। অবিশ্যি সিল্কের ব্যবহার চীনে সবচেয়ে প্রাচীন। সেজন্যে সিল্কের উপর বিভিন্ন কাজই বয়নশিল্পের বেশীর ভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে। পশ্চাত্যের মনীষী অরেল ষ্টাইনের চেষ্টাতেই চীনা সিল্কের কাজগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব হয়েছে। অরেল ষ্টাইন গুপ্ত শিল্প ঐতিহ্যের সন্ধানে বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় স্বীকার করে মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে অনুসন্ধান কাজ চালান। ১৯১৪ সালে মধ্য এশিয়ায় তাঁর তৃতীয় অভিযানের সময় তিনি কয়েকটি কবরস্থান থেকে সিল্কের কাজ উদ্ধার করেন। প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার মরুভূমির এই পথেই পশ্চিমের তথা পারস্য প্রভৃতি দেশের সংগে চীনা সিল্কের বাণিজ্য চলত। ষ্টাইন তাঁর আবিষ্কৃত সিল্কগুলি

যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে তৈরী এই সিদ্ধান্ত করেছেন। চীনের শিল্পসৃষ্টি যে আধুনিক যুগেও অনেকটা ঐতিহ্যপ্রধান একথা আমরা আগে অনেকবার বলেছি। সিল্কের কাজগুলিতে ব্যবহৃত নক্সার মধ্যেই আমরা তার প্রমাণ পাই। ড্রাগন, জন্তু, পক্ষী, ঘোড়সওয়ার, আকাশের মেঘ, ফুলের ডাঁটা এবং বুটী কাটার যে সমস্ত প্রাচীন নক্সা দেখা যায় তার সংগে আজকের নক্সার গভীর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। চিত্রকলা বিশেষ করে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি এখানেও নক্সা আর রঙের ব্যবহার দর্শনও ধর্মগত বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন নক্সার যথাযথ প্রয়োগবিধি তৈরী করা হয়েছিল এবং এক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রঙের অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি কতগুলি নক্সা আর রঙের প্রয়োগ কেবলমাত্র রাজপরিবারের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। তেমনিভাবে অন্য কতকগুলি উচ্চবংশ জাতদের জন্য ব্যবহৃত হোত। চীনা শিল্পীরা অবিশ্যি প্রকৃতিকে নিখুঁত রূপ দেওয়ার ব্যাপারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে তারা পৌরাণিক এবং প্রতীকধর্মী বিষয়ের রূপায়ণকে পরিত্যাগ করেন নি।

চীনের বয়নশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনগুলির যে কালানুক্রমিক বিবর্তন, তার সূদীর্ঘ পরিসরে নানা বৈদেশিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চীনদেশ সভ্যতায় সুপ্রাচীন। তাই এটা সহজেই আশা করা যায় যে বিদেশের সংগে চীনের কৃষ্টিগত সম্পর্ক সব সময়েই বজায় ছিল। টাঙ রাজবংশের (৬১৪-৯০৬ খৃঃ)

আমলে এই সম্পর্কের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। চীনা বাণিজ্য-পোতগুলি এই সময়ে পারস্য উপসাগরের বন্দরে যাতায়াত করত। আরব্য ঐতিহাসিক মামুদি সমসাময়িক কালের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে বয়নশিল্পে চীনা শিল্পীদের অভূতপূর্ব দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন। টাঙ যুগের অনেক বয়ন শিল্পের কাজে পারস্য রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর উল্টোটাও অবিশ্যি সত্য। বহু উৎকৃষ্ট পারসিকে গালিচার নক্সাও চীন থেকে গৃহীত। বৌদ্ধধর্ম মারফৎ চীনের সংগে ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ টাঙ আমলেই বিশেষ ঘনিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত একটি সিল্কের পরদায় লক্ষ্য করা যায় বোধিসত্ত্ব ও অনুগামী পরিবৃত বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তি। এটি অরেলষ্টাইন ১৯০৮ সালে কানসুপ্রদেশে হাজার বুদ্ধের গুহা তুঙহুয়াঙ থেকে সংগ্রহ করেন। জাপানের পুরাতন রাজধানী নারাতে (Nara) অবস্থিত হোরিউজি মঠে প্রাপ্ত একটি সিল্কের পতাকায় পারস্যিক পদ্ধতির প্রভাব সুস্পষ্ট। পতাকাটিতে এক সাসানীয় সম্রাটের শিকার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। কয়েকটি বৃত্তের মধ্যে সমস্ত পরিকল্পনাটি স্থান লাভ করেছে। এটি বর্তমানে টোকিও মিউজিয়মে সংরক্ষিত। এরপর আসে য়ুয়ান বংশের আমল। ১২৮০ খৃঃ বরাবর কুবলাই খাঁ এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বাণিজ্য-জাহাজগুলিকে এই সময়ে ভারতবর্ষ এবং লোহিত সাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলিতে দেখা যেত। বিখ্যাত ভেনিসীয়

পর্যটক মার্কো পোলো এই যুগেই চীন পরিভ্রমণ করেন এবং চীনাদের শ্রমশীলতা, দক্ষতা এবং মহত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন। বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন মধ্যযুগীয় চার্চগুলিতে যে সমস্ত সিল্কের সাক্ষাৎ মেলে তা য়ুয়ান বংশের আমলেই আনীত হয়। এই সিল্কগুলিকে tapestry বা হাতে তোলা বিভিন্ন চিত্র বিশিষ্ট পরদা বলা হয় এবং চার্চে এর ব্যবহার খুবই ব্যাপক। কতকগুলি পশুপক্ষী ও ড্রাগনের চিত্র-সমন্বিত পরদার কাজে পশ্চিমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এন নাসিরের সম্মানার্থে প্রদত্ত একটি কাজে আরবিক অক্ষর চোখে পড়ে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ইউরোপের চার্চগুলি ছাড়াও মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতেও চীনা বয়ন শিল্পের যথেষ্ট কদর ছিল। আর এটা অস্বাভাবিক নয়; কারণ পারস্য প্রভৃতি দেশগুলি তো গালিচা আর বুটীদার কাজেরই দেশ। এখানে একটা কথা বলা উচিত, বিশেষ করে মুসলমান দেশগুলিতে ব্যবহৃত সিল্ক প্রভৃতি কাজ সবই যে চীন থেকে আমদানী করা হোত তা নয়। অনেকগুলি স্থানীয় ভাবে পরিপূর্ণ চীনা প্রভাবের মধ্যে তৈরী। এ ছাড়া চীনের মধ্যে ব্যবহৃত এবং রপ্তানীর জন্য তৈরী জিনিষ এ দুয়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য এ যুগে চোখে পড়ে না। অবিশ্যি এক্ষেত্রে পার্থক্য পরে সৃষ্টি হয়।

এর পরে চীনা বয়ন শিল্পের ইতিহাস পুরাপুরি ইউরোপের সংগে সম্পর্কের ইতিহাস। ১৫১৭ সালে সর্বপ্রথম পর্তুগীজেরা চীনের বন্দর ক্যাণ্টনে উপস্থিত হয়। ক্রমে ক্রমে ইউরোপের

অন্যান্য জাতি প্রথমে বাণিজ্য তারপর বন্দর দখলের মারফৎ বিপুল লাভজনক ব্যবসা গড়ে তোলে। এ ইতিহাস এশিয়াবাসী হিসাবে আমাদের সকলের পরিচিত। অবিশ্যি পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে যারা আসে তাদের বেশীর ভাগই ছিল ব্যবসায়ী। জিনিষের কেনাবেচার মধ্যে দিয়ে লাভটার গতিই ছিল তাদের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু ইউরোপের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে curio হিসাবে প্রাচ্যের শিল্পদ্রব্যের একটা চাহিদা ছিল। এছাড়া ইউরোপের চার্চগুলিতে চীনা পরদা (tapestry) ব্যবহারের কথা আগেই বলেছি। ব্যবসায়ীরা এই চাহিদার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এইজন্যই আমরা দেখতে পাই ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে চীনের বিভিন্ন ধরণের শিল্পসামগ্রী ইউরোপে প্রেরিত হয়। এই শিল্পসামগ্রীগুলিই বর্তমানে অভিজাতশ্রেণী ও চার্চের হাত থেকে ইউরোপের বিভিন্ন মিউজিয়ামে সংগৃহীত হয়েছে। অবিশ্যি এর মধ্যে অনেক অর্ডারই কাজ আছে। যেমন চার্চে ব্যবহৃত সিল্কের পরদাগুলিতে যে সমস্ত চিত্র দেখা যায় তা খৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধীয়। এথেকে বোঝা যায় ইউরোপের বিখ্যাত চার্চগুলি চীন থেকে তাঁদের প্রয়োজনমত জিনিষ তৈরী করিয়ে নিতেন। চীনা কারিগরও উপার্জনের আশায় এ ধরণের অর্ডারই কাজ করতে বাধ্য হতেন। তাই এই ধরণের কয়েকটি কাজ দেখে আমাদের পক্ষে চীনা বয়নশিল্পের গুণাগুণ বিচার করা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। অথচ পাশ্চাত্যের চীনা-শিল্প-

সমালোচনার বইগুলিতে এই প্রকার রপ্তানীকৃত জিনিষের ভিত্তিতেই আলোচনা করা হয়েছে। একথা ঠিক চীনা কারিগরেরা স্বাধীনভাবে এবং নিজেদের জন্যে যে কাজ করেছেন তার খুব বেশী নিদর্শন ইউরোপের সংগ্রহশালায় নেই। আর ইউরোপীয় শিল্পসমালোচকেরা তো একথা স্বীকারই করেছেন ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে পরেকার কাজগুলিতে রপ্তানীর জন্য তৈরী জিনিষ এবং আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য তৈরী জিনিষের মধ্যে শিল্পগত দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তবে এ ব্যাপারে আমাদের সামনে চীনের প্রাচীন আমলের অর্থাৎ টাঙ, সুঙ আমলের বয়নশিল্পের কাজগুলি রয়েছে যা দৃষ্টিকে মোটেই বিভ্রান্ত করতে পারে না।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ন্যায় বয়ন শিল্পের প্রয়োজন মূলত ব্যবহারিক কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই দেখা যায় কলা (art) জিনিষটা শুদ্ধ পর্যায়ে আটকে থাকে নি, তার সাহায্যে দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিষকেও শ্রীমণ্ডিত করা হয়েছে। আর চীনা জাত যাঁদের দৃষ্টিই হচ্ছে শিল্পীর দৃষ্টি তারা এব্যাপারে অভূতপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ঘর এবং বাহির এ দুয়ের মধ্যেই সুন্দরের উপস্থিতি হচ্ছে চীনাদের কাম্য। তাই তারা ঘরকে অপরিসীম ধৈর্যের সংগে তৈরী বয়ন শিল্পের নিদর্শনগুলি দিয়ে সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করেছে। অবিশ্যি আগেকার দিনে চার্চের বৃহৎ অট্টালিকা আর ধনীর প্রাসাদের এগুলি শোভাবর্ধন করত। বর্তমানে অবিশ্যি মানুষ আরও পরস্পর

ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং সংসারকে তারা ছোটোর মধ্যে নিবিড় করে পেতে চায়। এদিন থেকে বড় কাজের চাহিদা কমেছে এবং সূচীশিল্পের ছোট কাজগুলির বিশেষ গুরুত্ব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বয়নশিল্পের প্রয়োজন কমেনি কারণ আমাদের জীবনে ঘরের শুধু কারিগরী দক্ষতা আর ধৈর্যবোধের পরিচায়ক নয়। এ থেকে জাত হিসাবে তাদের পরিচ্ছন্ন মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য শিল্প

এখন পর্যন্ত চীনা শিল্পের নানা বিভাগের যে পরিচয় দেওয়া হোল তার মধ্যে সবগুলিরই ধারা চীনে বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এছাড়া আলোচ্য শিল্পের অন্যান্য দিকও রয়েছে যেমন ব্রোঞ্জ, জেড্ (পাথর জাতীয় পদার্থ), এনামেল, লাক্ষার কাজ ইত্যাদি। এগুলির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় বলে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের মত চীনদেশেও ব্রোঞ্জের উন্নত ধরণের কাজ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ব্রোঞ্জের মধ্যে আমরা মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি, বিভিন্ন ধরণের বাসনপত্র, সোণা ও রূপার পাত বসানো কাজ, প্রসাধনের দ্রব্য ইত্যাদি লক্ষ্য করি। অনেক সময় ব্রোঞ্জের তৈরী বাক্সের ডালার ভিতরের অংশে চিত্রসজ্জা চোখে পড়ে। ভারতের মত চীনদেশে ধর্মীয় ব্রোঞ্জ মূর্তির প্রচলন ছিল। দক্ষিণ ভারতের চমৎকার ধর্মীয় ব্রোঞ্জমূর্তিগুলির কথা অনেকেই জানেন। ঠিক এইভাবেই চীনে বুদ্ধ, দেবতা, কুয়ান ইন, পুরোহিত, ধর্মগুরু

৫নং চিত্র

৬নং চিত্র

প্রভৃতির মূর্তি নির্মিত হয়েছে। তারপর ব্রোঞ্জের উপর খোদাই করে নক্সা কেটে নিয়ে ঐ নক্সার মধ্যে উচুঁ করে সোনা বা রূপার পাত বসিয়ে বাসন পত্র তৈরী করা হয়েছে। এগুলি আমাদের দেশের হায়দ্রাবাদী বিদ্‌রী বা মোরাদাবাদী কাজের মত। তবে চীনারা যে কোন জিনিষের উপর নক্সা তোলায় অদ্ভুত সিদ্ধহস্ত বলে শিল্পবস্তু হিসাবে ব্রোঞ্জগুলি খুব উচুঁস্তরের। আমাদের দেশে লক্ষৌতে এই ধরণের যে কাজ হয় তাতে চীনা নক্সার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জেড পাথরের কাজ চীনে বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। কারণ ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত চীনের প্রাচীন পূজা পার্বণে ব্যবহৃত জেডের কাজ রয়েছে যার তারিখ এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। চীনের পুরানো জেডের বৈচিত্র্য আমাদের সকলকে মুগ্ধ করে। সাদা জেডের একটি ভাণ্ডে (bowl) আমরা দেখি বাইরের দিকে বিবাহের প্রতীক নক্সা এবং ভিতরে দীর্ঘায়ুর চিহ্নস্বরূপ পিচ ফলের উপস্থিতি, আর ভাণ্ডটির হাতলটিতে প্রজাপতির কাজ। এমনিভাবে জেডের নক্সা করা লম্বাটে ধরণের কান, সবুজ ও খয়েরী রঙের বড় আংটি মন্দিরের গায়ে bas-relief এর আকারের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাস্কর্যের কাজ ইত্যাদি দেখা যায়। শিল্পীরা জেড পাথরের রঙ আর গুণ দেখে সেই অনুসারে তাতে কারুকার্য করেন যার ফলে বিশেষ করে গাছ পালা, পাখী বা মানুষের খোদাইগুলি অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে ওঠে। লাক্ষার কাজও চীনে খুব পুরাতন। খৃষ্ট

পূর্ব ৮৪৭-২২২ এর মধ্যে চু সম্রাটদের আমলে তৈরী লাক্ষার কাজের অদ্ভুত রঙ এবং নক্সার সমন্বয় দেখলে পর মুগ্ধ হতে হয়। হান বংশের (খৃঃ পূঃ ২০৬ থেকে খৃষ্টাব্দ ২২০) আমলেও লাক্ষার কাজের অদ্ভুত উন্নতি হয়। সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে দেখা যায় লাক্ষার উপর সোনা বা রূপার তার, মূল্যবান পাথর প্রভৃতি বসানো হচ্ছে এবং কখনও কখনও তা আবার রঙও করা হচ্ছে। দশম শতাব্দীতে গভীরভাবে খোদাই কাজ করা লাক্ষার শিল্প দ্রব্যগুলি নির্মাণে বিস্ময়কর কারিগরী দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময় একজন অভিজ্ঞ কারিগরের পক্ষে এই ধরণের একটি কাজ সমাপ্ত করতে এক থেকে দুই বছর সময় লাগত।

চীনে এনামেলের উপর যে নক্সার কাজ পাওয়া যায় তাকে cloisonne বলা হয়ে থাকে। এই শিল্প বস্তুটি প্রধানত পিকিং অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য। অবিশ্যি এনামেলের উপর নক্সা তোলার পদ্ধতি চীনের নিজস্ব অবদান নয়। কারুর কারুর মতে আরব ব্যবসায়ীরা সমুদ্র পথে চীনের কোয়াংটাঙ প্রদেশে এই পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেন। আবার অনেকে বলেন ঠিক আরবেরা নয়, ইউরোপ থেকেই চীনে এই জিনিষের প্রচলন ঘটে। পিকিং মিউজিয়মে সংরক্ষিত পুরানো cloisonne কাজের একটির নির্মাণকাল হচ্ছে ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে। এনামেলগুলিতে আমরা প্রাকৃতিক জগৎ থেকে নেওয়া বিভিন্ন নক্সা লক্ষ্য করি। লতা বৃক্ষ এবং পশু পক্ষীই এর মধ্যে প্রধান। গত কয়েক শতাব্দীতে

এনামেলের শিল্প বস্তু নির্মাণ অনেকটা ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ায় নক্সার ক্ষেত্রে খেলো ভাবধারার আধিক্য ঘটে। সেই জন্য বর্তমানে চীনা কারিগরেরা নক্সাগুলির পুনরায় সহজ ও স্বাভাবিক রূপ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। Cloisonne কাজে চীনে যে আজকাল কেবল দামী বা নিছক উপভোগের বস্তু তৈরী হচ্ছে তা নয়। শিল্পীরা দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী টেবল-ল্যাম্প, ধূমপানের উপযোগী জিনিষ প্রভৃতিও এই পদ্ধতিতে তৈরী করছেন। এরপর আসে হাতীর দাঁতের খোদাই কাজের কথা। এই ধরণের জিনিষে পিকিং এবং ক্যাণ্টনের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। তিন হাজার বছর আগে ইন (yin) বংশের আমল থেকে চীনে হাতীর দাঁতের খোদাই করা শিল্পবস্তুর প্রচলন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে পিকিং-এর যে ধারা, তাতে দেখি বাস্তব ধর্মী ছোট খাটো মূর্তি, বিশেষ করে পোকা মাকড় এবং তরিতরকারীর। হাতীর দাঁতের তৈরী ফুল কপির উপর যে হাতীর দাঁতের ফড়িংটি বসে রয়েছে তা স্পর্শ করতে লোকে ইতস্তত করে যদি ফড়িংটি উড়ে যায়। ক্যাণ্টনের যে অবদান সেখানে খোদাইয়ের অদ্ভুত খুঁটি নাটি সুক্ষ্মতা সবচেয়ে আদরনীয়। এখানকার শিল্পীরা কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ হাতীর দাঁতের গোলাকার মণ্ডের উপর সরু সূতার আকারে অপূর্ব জালির কাজ করতে পারেন। অবিশ্যি হাতীর দাঁতের উপর চীনে যে কেবল নক্সার কাজ হয় তা নয়। এর সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের মূর্তিও তৈরী করা হয়

যেগুলি নক্সার কাজের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক নয়। দক্ষ শিল্পীর হাতে পাথরের মূর্তি তেমনি হাতীর দাঁতের মূর্তিকেও জীবন্ত রূপ দেওয়া যায়। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যকে এখানে পরিষ্কার ভাবে ধরা চলে। ইচ্ছা করলে আবার সাধু সন্ত বা পৌরাণিক কোন ব্যক্তির মূর্তিতে প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন হাতীর দাঁতের প্রাচীন মূর্তির বহু নিদর্শন এখনও চোখে পড়ে।

উপরিউক্ত শিল্প দ্রব্যগুলি ছাড়াও চীনে আরেক ধরণের কাজ পরিলক্ষিত হয়। একে আমরা fan বা পাখা বলতে পারি। অনেকেই জানেন ইউরোপের মত চীন ও জাপানে অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হয়ে থিয়েটার বা পার্টিতে এই ধরণের হাত পাখা ব্যবহার করেন। অন্য কোন প্রয়োজন না থাকলেও আদব কায়দা হিসাবে এগুলি প্রধানত ব্যবহার করা হয়। ইউরোপে না হলেও চীন ও জাপানে এই পাখাগুলির প্রত্যেকটিই একটি উৎকৃষ্ট শিল্প বস্তু। প্রত্যেকটি পাখার দুই পিসকেই চীনা শিল্পীরা অঙ্কন কার্যের বিশিষ্ট মাধ্যমরূপে বিবেচনা করে থাকেন। সাধারণ কাগজ বা সিল্কের উপর ছবি আঁকার সময় শিল্পীরা যতটা নিষ্ঠা আর ধৈর্যের সংগে কাজ করেন পাখাকে চিত্র-বিচিত্র করার ব্যাপারেও আমরা সমান নিষ্ঠা ও ধৈর্যের পরিচয় পাই। পাখাগুলির হাতল সাধারণত হাতীর দাঁতে নির্মিত। অবিশ্যি অভিজাত মহিলাদের দ্বারা এই প্রকার সুদৃশ্য হাত

পাখার ব্যবহার চীনের নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। এ জিনিষটি জাপান থেকেই চীনে প্রবর্তন করা হয়। তবে কবে তা হয়েছিল তার সঠিক কোন সময়কাল জানা নেই। পাখার গায়ে যে ছবি আঁকা হোত তা চীনা চিত্রকলার বিশিষ্ট রীতিকে অনুসরণ করেই। এখানে ফুল-পাতা-প্রজাপতির নক্সার বিশেষ প্রাধান্য। মোট-কথা পাখা-গুলিকে কেবল আদবকায়দার বিষয় হিসাবে না দেখে সত্যিকার শিল্পগতরূপে নির্মাণ করা হোত। চীনা শিল্পের অন্যান্য বিভাগের মত এগুলিও এক বিস্ময়-কর সৃষ্টি।

কাঠ খোদাই

চীনা কাঠ খোদাই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এর পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথমে দু'এক কথা বলে নেওয়া উচিত। শিল্পের এই বিশিষ্ট মাধ্যমের সংগে প্রচার ও জীবনের সংঘাতময় বা গতিশীল আলেখ্য বর্ণনার ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কাঠ খোদাইয়ের কাজে টেকনিকের মারামারি বা অ্যাবষ্ট্রাকশনের কোন বালাই নেই। লেখাপড়া জানা মানুষের কাছে এর আংগিক সব সময়েই সহজবোধ্য। এক কাঠ খোদাই থেকে আর এক কাঠ খোদাইএ বড় একটা আংগিকগত বিভিন্নতা আনা যায় না, কারণ জিনিষটা আসলে খোদাই। সেজন্যে তার প্রকাশের নির্দিষ্ট পরিসর থেকে গেছে। তুলিতে রঙের সাহায্যে যে sublimation কিম্বা নির্বাচনের সাহায্যে অভিজ্ঞতার সাধারণীকৃত রূপ তা কাঠ খোদাইয়ে মোটেই সম্ভব নয়। কাঠ খোদাইয়ের সার্থকতা নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে বিষয় বস্তুর নির্বাচন চাতুর্যের উপর। আলোচ্য শিল্প মাধ্যমে যেহেতু সূক্ষ্ম আংগিকের মারপ্যাঁচ নেই

এবং যেহেতু এখানে নিছক কল্পনার দৃষ্টিতে বিষয়ের কথা চিন্তা করা হয় না সেইহেতু বিষয় বেছে নেওয়ার ব্যাপারে কোন বিশেষ বাছবিচার নেই। সমাজ ও জীবনের দৈনন্দিন আলেখ্য তা যদি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাববিস্তারকারী হয় তবে তা এই মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। সেইজন্যই বলছিলাম কাঠ খোদাইয়ের একটা দিক আছে, যেখানে কোন আদর্শ বা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জনজীবনকে প্রবাহিত করা যায়। তাছাড়া কাঠ খোদাইয়ে print এর ব্যবস্থা থাকায় প্রচারের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই মাধ্যমে তীক্ষ্ণ বস্তুর সাহায্যে যে নক্সা খোদাই করা হয় তার আপেক্ষিক সম্পূর্ণতার জন্যই বিষয়বস্তুর প্রকাশে বলিষ্ঠভংগী ও গতির সঞ্চার হয়। এর ফলে বিষয়বস্তুর আপন গুরুত্ব, সহজ-বোধ্য আংগিক এবং বলিষ্ঠ প্রকাশ, এ সমস্ত মিলে কাঠখোদাইয়ের সমাদর সকলের কাছেই। এজন্যই আবার এই শিল্প মাধ্যমের একটা illustration এর দিকও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বক্তব্য পরিস্ফুট কিম্বা প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য আমরা লিখিত অংশের সংগে দৃষ্টান্ত হিসাবে কাঠ খোদাই সংযোজিত দেখি। আর যেহেতু এখানে একটি মাত্র রঙ ব্যবহৃত হয় সেজন্য বক্তব্যের সংগে এই ধরণের illustration সংযোজনায় সুবিধা হয়েছে। ফলে কাঠ খোদাইয়ের সহজ অথচ পরিবেশনের গুণে জীবন্ত শিল্পসৃষ্টির সাহায্যে জনসাধারণের শিল্পবোধ জাগানো এবং শিল্পের সামাজিক মূল্য প্রতিপন্ন করা সহজসাধ্য হয়েছে। চীনা শিল্পে কাঠ খোদাই পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের এই

কথাগুলি মনে রাখতে হবে। তা না হলে জনগনের নতুন চীনে কাঠ খোদাই পদ্ধতির প্রকৃত তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করতে পারব না।

চীনে কাঠ খোদাই পদ্ধতির প্রচলন অনেকদিনের। আমরা জানি ঐ দেশে লিখিত অক্ষরের পদ্ধতি হচ্ছে ক্যালিগ্র্যাফিক। এই ক্যালিগ্র্যাফিক পদ্ধতি বহুলাংশেই চিত্রধর্মী। অর্থাৎ চীনা চিত্র একান্তভাবেই লিখিত অক্ষরের সম্প্রসারণ। চীনদেশেই প্রথম ছাপার অক্ষর আবিষ্কৃত হয় এবং গোড়াতে কাঠের অক্ষরই প্রচলিত ছিল। এছাড়া ঐতিহ্য প্রধান চীনা চিত্রে আমরা লক্ষ্য করি শিল্পী ক্যানভাসেরই একধারে এক ধরণের কাঠের প্রতীক বা নামচিহ্ন ব্যবহার করেছেন বা আমাদের দেশে মিষ্টি প্রভৃতি তৈরী করায় ব্যবহৃত কাঠের ছাপার মতই। তাই মনে হয়, চীনদেশে কাঠ খোদাইয়ের প্রচলন এই সমস্তেরই পরিণত ফল।

সাম্প্রতিক কালে কাঠ খোদাইয়ের বিকাশে চীনারা জার্মানি মহিলা শিল্পী কাথে কোলভিজের (১৮৬৭-১৯৪৫) কাছে বিশেষ-ভাবে ঋণী। কোলভিজে তাঁর সারা জীবনের সাধনায় গ্র্যাফিক্ শিল্প অর্থাৎ কাঠ খোদাই—লিথোর ক্ষেত্রে অবিনশ্বর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এই সমস্ত কাঠ খোদাই-লিথোর বিষয়বস্তু সমসাময়িক কালের ঘটনাবলী। কোলভিজের প্রত্যেকটি চিত্রই সুস্থ মানবতাবোধে উজ্জ্বল। অন্যায়, অত্যাচার, দারিদ্র্য, মানুষের অপমান যেখানেই তিনি দেখেছেন সেখানে চিত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম থাকায়

কাঠ খোদাই লিথো অঙ্কনপদ্ধতিকে তিনি যথেষ্ট উন্নত করে তোলেন। ঔপন্যাসিক লু-সুন, যাঁকে চীনের গোর্কী বলা হয়ে থাকে, তিনি কোলভিজের এই কাজ দেখে অদ্ভুতভাবে অনুপ্রাণিত হন। লু-সুনই হচ্ছেন চীনের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম গুরু। তাঁর দৃষ্টি সব সময়ই চীনের সংস্কৃতিকে উন্নত ও প্রগতিশীল করে তোলার প্রতি নিবদ্ধ ছিল এবং এ ব্যাপারে অন্যদেশের ভালো কিছু দেখলে তাকে গ্রহণ করতে মোটেই দ্বিধা করতেন না। ১৯৩০ সালে লু-সুন যখন সাংহাইয়ে কাজে ব্যস্ত তখন ঐ শহরে প্রগতিশীল সব কিছুর উপর পুলিশের খরদৃষ্টি। তবে সাহিত্যের বদলে শিল্পের মাধ্যমে প্রগতিশীল ভাবধারার প্রচারে পুলিশের দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব। একথা স্মরণে রেখেই ১৯৩০ সালে সাংহাইয়ে লু-সুন কাথে কোলভিজের আঁকা চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনীর মুখবন্ধ হিসাবে লু-সুন বলেন চীনারা যে তাঁদের প্রগতিশীল আন্দোলনে একা নয় তাঁদের সাথী যে পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে রয়েছে একথা জানানোই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। কাথে কোলভিজের কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই চীনা শিল্পীরা কাঠখোদাইকে তাঁদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট সহায়করূপে গ্রহণ করেন।

শিল্পের কতকগুলো দিক আছে যাকে কেবলমাত্র সূক্ষ্ম কলা বলা যায় না। সেখানে মাধ্যমের বিশিষ্টতার জন্য craftsmanship-এর প্রয়োজন হয়। কাঠ খোদাই হচ্ছে মূলতঃ craft, আর craft-এর পর্যায়ে পড়ায় এই কাজে পরিপূর্ণ

সংযমবোধ এবং হাতের নিপুণ দক্ষতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনদেশে কাঠ খোদাইয়ের বহুল প্রচলন ও তার উৎকর্ষের কারণই হচ্ছে যে, চীনা জাতটা আসলে craftsman-এর জাত। এর পরিচয় যে শুধু আমরা কাঠ খোদাইয়ের মধ্যে পাই তা নয়। অন্যান্য বিষয়েও, যেমন কিয়াংসির চীনা মাটির তৈরী অপূর্ব নক্সাসমেত প্লেট কি ছোট মূর্তি প্রভৃতিতেও এর পরিচয় পেয়ে থাকি। ঐতিহ্যপ্রধান চীনা চিত্রগুলি অবিশ্যি ঠিক craft-এর পর্যায়ে পড়ে না। তবে চীনা নৈসর্গিক চিত্রে যে নিখুঁত ও মননসাপেক্ষ কাজ লক্ষ্য করা যায় তা craft-এর পক্ষে প্রয়োজনীয় সংযমবোধ ও দক্ষতার অপেক্ষা রাখে বৈকি। চীনা শিল্পীর অনন্যসাধারণ শিল্পবোধ, আঙ্গিক আর রঙের পরিণতজ্ঞান এবং craft-এর উপর অধিকার এ সমস্তের মিলিত রূপের মধ্যেই চীনা শিল্পের অবিনশ্বরতা প্রতিষ্ঠিত। এই সংমিশ্রণের জন্যই আমরা দেখছি চীনা শিল্পের দুই দিক, সূক্ষ্ম ও ব্যবহারিক—যা আবার পরস্পর নিকট সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত। তাহলেই আমরা দেখছি যে, চীনা শিল্প মানসে রয়েছে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির উপস্থিতি যা এসেছে প্রধানত craft-এর জ্ঞান থেকেই। আর এই উদ্ভাবনী শক্তি কেবল সূক্ষ্ম এবং ব্যবহারিক শিল্প এ দুয়ের কোন একটার মধ্যে থাকেনি। দুয়ের মধ্যেই সহজ আদান প্রদান বা যাতায়াতের ভূমিকা রচনা করেছে। এই জন্যই চীনা শিল্প এতটা সজীব এবং শিল্পকর্ম জিনিষটাও সব সময় বিস্ময়কর পরীক্ষা নিরীক্ষায় পূর্ণ।

শিল্পে সূক্ষ্ম ও ব্যবহারিকের সুষ্ঠু সম্পর্ক একটা বড় সমস্যা। কারণ অনেকের মতে সূক্ষ্মকলায় যে কল্পনার বিস্তার আয় আঙ্গিকের আভিজাত্যতা, ব্যবহারিক শিল্পে বজায় থাকে না। একথা অবিশ্যি ঠিক, যে ছবিতে কল্পনার অবসর নেই তার বিষয়বস্তু যতই নিখুঁত এবং বাস্তবধর্মী হোক না কেন তা আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। কারণ প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ চিত্রেই ঐ কল্পনার ফাঁক বা অবসর সৃষ্টির মধ্য দিয়েই শিল্পী দর্শকের মনকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করেন। কিন্তু ছবিতে এই কল্পনা জিনিষটা absolute কিছু নয়, তার একটা অবলম্বন সব সময়েই আছে এবং সে অবলম্বন হচ্ছে দেশকালপাত্রে গ্রথিত অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতার বর্ণনায় শিল্পী কল্পনা জিনিষটাকে এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন যা দর্শকের চেতনাকে সহজ এবং জীবন-নির্ভর করে তুলতে সাহায্য করে। এখন ব্যবহারিক শিল্পে কল্পনা নেই বা এইভাবে যে কল্পনার অবসর সৃষ্টি করা যায় না তা মোটেই নয়। বরং উদ্ভাবনী শক্তি, সংযমবোধ এবং দক্ষতার সাহায্যে কল্পনাগত বিস্ময়কর ভাব সহজেই সৃষ্টি করা চলে। সাম্প্রতিক চীনা কাঠ খোদাই এবং লিথোগ্রাফের কাজে আমরা এই ঘটনাই লক্ষ্য করছি। তা ছাড়া কোন দেশে একই সময়ে শিল্প প্রকাশের সব কটি মাধ্যম সমভাবে ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে না। শিল্প যেহেতু আধিভৌতিক জগতের সৃষ্টি নয় এবং দেশকালপাত্র গ্রথিত অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি সেহেতু এক এক সময়ে এক এক বিশিষ্ট শিল্প

মাধ্যমের প্রসার ও উন্নত রূপ লক্ষ্য করা চলে। এ জিনিষটা নির্ভর করে জাতীয় জীবনের বিশেষ অবস্থা, শিল্পীর প্রকাশের সুবিধা এবং উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার উপর। সেজন্যই বলার কথা সূক্ষ্ম ও ব্যবহারিকের কৃত্রিম ব্যবধান শিল্পের ক্ষেত্রে একান্তই অচল। চীনা কাঠ খোদাই দেখার সময় এই কথাটাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

চীনে সাম্প্রতিককালে কাঠ খোদাইয়ের বহুল প্রচলন ও সমৃদ্ধি প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিনটাঙ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণ মুক্তি আন্দোলনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯২৭ সালের পর বিশেষ করে ১৯৩৪ সালের লংমার্চের ফল হিসাবে চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুক্ত এলাকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কাঠ খোদাইয়ের নতুন বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়। চীনে এই মুক্ত এলাকার উপর ভিত্তি করে প্রথমে জন-বিরোধী যুদ্ধ এবং পরে কুয়োমিনটাঙ চক্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় তারই প্রস্তুতি ও পরিচালনার সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসাবে কাঠ খোদাইয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অবলুপ্তি এবং নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জন-চেতনার প্রভাবিত করার ব্যাপারে শিল্পের চেয়েও বোধ হয় আর কোন শ্রেষ্ঠ মাধ্যম নেই। কারণ যে জিনিষ মানুষের মনে শুধু বুদ্ধির খোরাক না হয়ে ভাবাবেগও সৃষ্টি করতে পারে তার প্রভাব হয় দীর্ঘস্থায়ী। চীনের অতি বিচিত্র এবং বিস্ময়কর শিল্প মানসে ঐ উপলব্ধি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল। মুক্ত এলাকায়

এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরে কুয়োমিনটাঙ শাসিত এলাকায় শিল্পীরা উদ্ভাবনী শক্তি এবং craft-এর জ্ঞানের গুণে কাঠ খোদাইকে বেছে নেন তাঁদের নতুন শিল্প সৃষ্টির প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে। চীনে ১৯২৭-৩৬ সালের ২য় বিপ্লবী গৃহ যুদ্ধের যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যে অজস্র কাঠ খোদাইয়ের কাজ হয়েছে তা ক্রমিক অনুসরণ করলে সাম্প্রতিক চীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পূর্ণ আলেখ্য পাওয়া চলে যা ছাপার অক্ষরে ইতিহাস পাঠের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ নয়। শিল্পীরা চারপাশের নবপরিণতিশীল আলোড়িত জীবন ও গুরুত্ব-পূর্ণ নানা ছোটখাটো ঘটনাকে কাঠ খোদাইয়ের বলিষ্ঠ মাধ্যমে রূপায়িত করেন। দ্বিতীয় বিপ্লবী যুগের কাঠ খোদাইগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লং মার্চের ক্রমিক দৃশ্যাবলী। জাপ-বিরোধী যুগের কাঠ খোদাইগুলিতে আমরা দেখি চীনের জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য যে সংগ্রাম তার প্রস্তুতির উপর নানা ছবি। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে চীনা কাঠ খোদাইয়ের এক নতুন পর্যায় সূচিত হয়। এই পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করি মুক্ত অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম এলাকার জনগণের চীনে জাতীয় পূনর্গঠনের কাজ কি ভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে তারই নানা আলেখ্য।

এ সমস্ত ছাড়া চীনে এক ধরণের কাঠ খোদাই রয়েছে যার আঙ্গিক একান্তভাবেই লোক শিল্পের আঙ্গিক ঘেঁষা। তাছাড়া এগুলির বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ গ্রাম জীবনের সংগে জড়িত।

বিশেষ করে বীজ বপন, শস্য উৎপাদন, লাঙলের কাজ, বাগান করা প্রভৃতিই হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। এগুলিকে সমগ্রভাবে Agricultural cycle pictures নামে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলি সবই গ্রামের লোকশিল্পীদের কাজ। সহজ বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত গ্রামের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের সংগে এই ধরণের কাঠ খোদাইয়ের ওতপ্রোত সম্পর্ক। মাঠের কাজ আরম্ভ হবার সময় শস্যবপন কি হলকর্ষণের ওপর আঁকা ছবির সাহায্যে ঘর সাজানো চীনাদের রীতি এবং এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ চাষী গৃহস্থের মনে এই আকাঙ্ক্ষাই উদ্বেলিত হয় যে, আগামী ফসল হবে সবচেয়ে সুন্দর। সাধারণ কাঠ খোদাইয়ের মত Agricultural cycle এর উপর কাজগুলিতে আমরা আঙ্গিকের তেমন তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করি না। মানুষের প্রতিকৃতি স্বাভাবিক ভাবে রূপায়িত না করে কিছুটা abstract করে আঁকা হয় ঠিক যেমনটি থাকে পুতুল নির্মাণের বেলায়। অর্থাৎ কল্পনার মাধ্যমে আভাসে আর ইঙ্গিতে রসাস্বাদন। সাজানো বা ডেকরেটিভ শিল্পের বৈশিষ্ট্যই এই। আর লোকশিল্পে সবদেশেই প্রায় এই ডেকরেটিভ নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

লিথোগ্রাফ

লিথোগ্রাফ জিনিষটি ঠিক সূক্ষ্মকলার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু কাঠ খোদাইয়ের বেলাতে যে কথা বলেছি এখানেও সেকথা বলতে হয় যে লিথোগ্রাফ আর্ট বহির্ভূত কিছু নয় এবং এ জিনিষটাও আজকে চীনে মানুষের শিল্পবোধকে পরিতৃপ্ত করছে। অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে সূক্ষ্মকলাকে (fine art) বাদ দিয়ে চীনাদের পক্ষে এভাবে minor arts নিয়ে ব্যস্ত থাকার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ সময়ে শিল্পের কিভাবে প্রসার ঘটবে তা নির্ভর করে সামাজিক প্রয়োজন তথা দেশকালের অবস্থার উপর। চীনে সম্প্রতি কাঠ খোদাই ও লিথো পদ্ধতির যে জনপ্রিয়তা দেখা গেছে তা সামাজিক কারণেই, সূক্ষ্ম কলা সৃষ্টিতে শিল্পীদের বিফলতার জন্য নয়। আর minor arts এর ব্যাপ্তিতে একথা বোঝায় না যে সূক্ষ্ম কলার চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া ইউরোপেও আমরা দেখেছি বিশেষ সামাজিক কারণেই Hogarth Goya

এবং Daumier লিথোপদ্ধতির উপর নজর দেন। যাই হোক লিথো পদ্ধতিতে লিথো তৈরীর জন্য বিশেষ পাথরের উপর প্রথমে এসিড লাগিয়ে নিয়ে তৈলাক্ত পেনসিলের সাহায্যে বিষয়বস্তু এঁকে নেওয়া হয়। এরপর পাথরটির উপর জল প্রয়োগ করলে অঙ্কিত রেখাগুলি তৈলাক্ত হওয়ার দরুণ সেই জল পরিত্যাগ করবে এবং অন্যান্য স্থান তা গ্রহণ করবে। এখন পাথরটির উপর যে কোন তৈলাক্ত রঙের রোলার টানার ফলে ভিজা স্থানগুলি এই রঙ গ্রহণ করতে পারবে না কেবল অঙ্কিত রেখাগুলিই তা গ্রহণ করবে। Hand-press এর সাহায্যে এখন ইচ্ছামত সংখ্যায় এর কপি নেওয়া চলবে। লিথোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একই ছবি একাধিক রঙে ছাপিয়ে নেওয়া চলে। সম্প্রতি চীন দেশে লিথোর বহুল প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন বিষয়বস্তুর সাহায্যে প্রত্যেক চীনবাসীর পরম্পরাগত এক চাহিদা মেটানো। চীনে নতুন বছরের সুরুতে ঘরবাড়ির অভ্যন্তরভাগ বিচিত্র রঙের কাগজপত্রও ছবির সাহায্যে সাজানোর রীতি আছে। পুরানো আমলে এই সমস্ত ছবিতে নানা দেবদেবী কিম্বা ড্রাগনের মূর্তি থাকতো। তাছাড়া চীনদেশে ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে বছরের সব কিছু কাজ যথা বিবাহ, বিদেশ যাত্রা, শস্য বপন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সমস্ত ক্যালেণ্ডারেও নানা দেবতার ছবি থাকে যা কেবল মানুষের অসহায় দিকটাকেই বড় করে দেখায়। নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পরম্পরাগত রীতির মূল আদর্শ বজায় রেখে ঐগুলির পুরানো এবং অনিষ্টকারী বিষয়বস্তুকে

বদলে ফেলা হচ্ছে। এখন আর আমরা ড্রাগনের মূর্তি বা প্রাচীন দেবদেবীর ছবি দেখি না, এর স্থান নিয়েছে সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলী। এখনকার লিথোগুলিতে লক্ষ্য করা যায় কিভাবে গ্রামবাসীরা ভালো ফসলের খবর জানিয়ে মাওকে চিঠি লিখছে, কিভাবে সুখী পরিবার গড়ে উঠছে, ক্ষেত খামারের কাজের মধ্যে চাষীরা বাড়তি ফসলের প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে, জনপ্রিয় নির্বাচন কিভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিভাবে জনশিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়বস্তু।

সাম্প্রতিক চীনা লিথো সম্পর্কে কারো কারো অভিমত এই যে এগুলি অল্প পরিসরে মানুষের ভিড়ে ভারাক্রান্ত এবং নানা রঙের প্রয়োগে দৃষ্টিকটু। এঁরা বলছেন পরম্পরাগত চীনা শিল্পে যখন স্থান ও পারম্পর্যজ্ঞান এবং রঙের নিপুণ প্রয়োগ পদ্ধতি অতিমাত্রায় পরিস্ফুট তখন সাম্প্রতিক লিথোগুলির উল্লিখিত ত্রুটি দুঃখের। এখানে বলা দরকার যে লিথো আর ঐতিহ্যপ্রধান সূক্ষ্মকলার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ বর্তমান। লিথো তৈরি করা হয় মূলতঃ কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং তার বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবন। সুতরাং দৃশ্যচিত্রে কল্পনা আর ভাবের বিস্তারের জন্য যে শূন্যস্থানের অবকাশ সৃষ্টি করতে হয় লিথোতে তা প্রয়োজন হয় না। আর নানা ধরণের রঙ প্রয়োগ করা হয় জনসাধারণের মধ্যে এগুলির ব্যাপক ব্যবহারের কথা স্মরণে রেখে। এটা চীনা শিল্পীর রঙের ব্যবহারে খেলো দৃষ্টির পরিচয় নয়। কিম্বা এ কথাও প্রমাণিত হয় না যে

সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত বলেই রঙের নিকৃষ্ট মিশ্রণে তাদের মনোরঞ্জন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে পটশিল্পের ক্ষেত্রে যেমন দেখি তেমনি চীনের সাধারণ মানুষের রঙ সম্পর্কে জ্ঞান কাঁচা নয়। তা ছাড়া আজ যখন তাঁদের নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করার অবাধ স্বাধীনতা তখন তাঁরা নিশ্চয় ফাঁকিকে সাচ্চা বলে স্বীকার করে নেবেন না।

———

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত চীনের বিভিন্ন রাজবংশের কালানু-ক্রমিক খসড়া নীচে দেওয়া হ'ল। এর মধ্যে সব বংশগুলিই যে চীনের শিল্প ইতিহাসের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়। প্রধানত হান্, টাঙ, সুঙ, মিঙ প্রভৃতি আমল চীনা শিল্পের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যময়।

শাঙ-ইন্ বংশ	খৃষ্ট পূর্ব ১৭৬৬ ?—১১২২ ?
চৌ বংশ	১১২২ ?— ২২১
বিবদমান রাজ্যসমূহ	৪৮১ — ২২১
চিন বংশ	২২১ — ২০৬
(পশ্চিম) হান্ বংশ	২০৬-খৃষ্টাব্দ ২৫
(পূর্ব) হান্ বংশ	খৃষ্টাব্দ ২৫ — ২২০
ছয়টি বংশের আমল	২২০ — ৫৮৯
তিনটি সাম্রাজ্যের আমল	২২১ — ২৮০
উত্তর ও দক্ষিণ বংশের আমল	৩৮৬ — ৫৮৯
সুই বংশ	৫৮১ — ৬১৮
টাঙ বংশ	৬১৮ — ৯০৬
পাঁচটি বংশের আমল	৯০৭ — ৯৬০
উত্তরের সুঙ বংশ	৯৬০ — ১১২৭
দক্ষিণের সুঙ বংশ	১১২৭ — ১২৭৯
য়ুয়ান বংশ	১২৭৯ — ১৩৬৮
মিঙ বংশ	১৩৬৮ — ১৬৪৪
চিঙ বংশ	১৬৪৪ — ১৯১২

চীনা শিল্প সম্পর্কে এতাবৎ প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা সুবিপুল। তার সমস্তর উল্লেখ এখানে সম্ভব নয় এবং বর্তমান পুস্তকের পক্ষে তার

প্রয়োজনও নেই। শুধু যে বই ও পত্রিকাগুলি চীনা শিল্পের উপর এই ক্ষুদ্র ভূমিকা প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করেছে এবং যেগুলি সকল পাঠকেরই দেখা দরকার তার উল্লেখ করা হচ্ছে।

Chinese Painting—William Cohn,
Phaidon Press, London 1948.

Chinese Art—Roger Fry, Lawrence Binyon etc,
B. T. Batsford & Co, London 1949.

Chinese Art—Leigh Ashton & Basil Gray.
Faber & Faber, London 1951.

Contemporary Chinese Woodcut with an introduction by Dr. Needham
Collet's Bookshop, London 1950.

China Reconstructs—Bimonthly Journal.

People's China—Fortnightly
Published from Peking.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	ভুল	নির্ভুল
১৬	১৫	অরজুতদের	অরহৎদের
৪৫	৪-৫	ঘরের শুধু	ঘরের প্রয়োজনও কমেনি। চীনা বয়নশিল্পী
৪৯	১৭	কান,	কাল,
৬০	১৩	জনবিরোধী	জাপবিরোধী
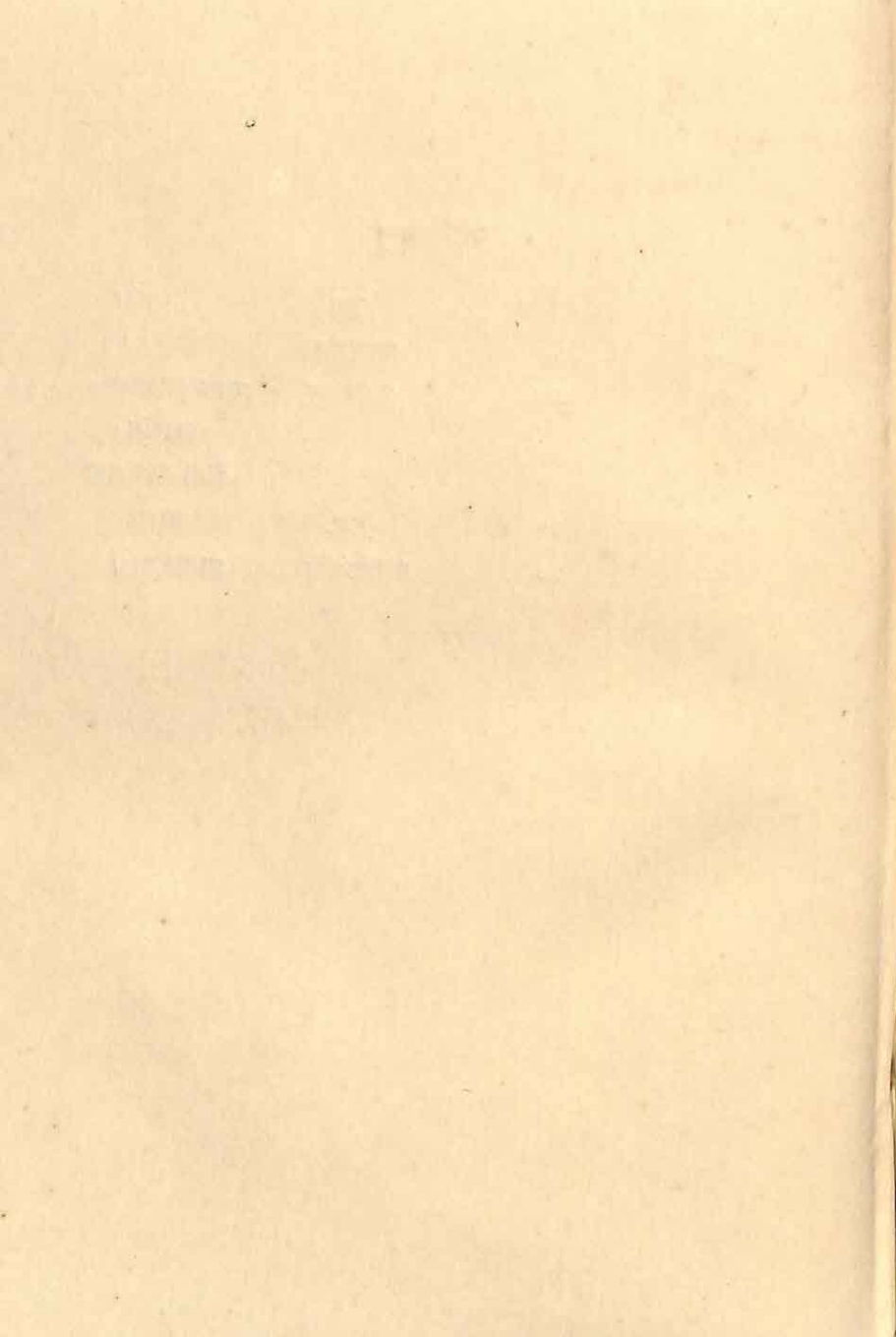
এই লেখকের

শিল্প আলোচনা সম্পর্কে আর একটি বই

শিল্পধারা

ত্থ'টাকা

ভূমিকায় বিষ্ণু দে লিখেছেন যে বাংলাদেশে প্রকৃত শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অগ্রণী হয়েছেন প্রভাতকুমার দত্ত তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি প্রভাতকুমারের এই সৎসাহসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শিল্প কি, শিল্প ও জীবনের সম্পর্কে শিল্পবিচারের পদ্ধতি, লোকশিল্পের ধারা, ভাস্কর্যের কথা, ভারত, চীন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্প পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে সরল অথচ সারগর্ভ আলোচনায় সমৃদ্ধ।

বহু আর্ট প্লেট সংযুক্ত শিল্প সম্পর্কে গাইডবুক